ষষ্ঠ অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এক প্রধান প্রাণপুরুষ । গল্প, উপন্যাস, এবং নাটক - সাহিত্যের এ তিনটি শাখাতেই তিনি সমানভাবে তাঁর অবদান রেখে গেছেন । যদিও তাঁর লেখার পরিধি খুব বেশি নয় । দু'টি গল্পগ্রন্থ, তিনটি নাটক, আর তিনটি উপন্যাস-তাঁর আয়ুষ্কালে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র এই আটটি বই । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মৃত্যুর পরে অবশ্য কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তার পরিমাণও খুব বেশি নয় । তবু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই স্বল্প লেখার মধ্যেই ওয়ালীউল্লাহের আত্মব্যক্তিত্ব এমনভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছে যে কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে ।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ১৯৪৭ সালে জন্ম নেয় দুটি দেশ- ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান । বৃটিশদের টানা পেন্সিলের দাগে সর্বনাশ নেমে আসে সীমান্তে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে । এই বিভাজনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারতবর্ষের যে দুটি রাজ্যের মানুষ তার একটি পাঞ্জাব এবং অপরটি বাংলা । একই ভাষা, একই সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হন বহু মানুষ । ব্যাহত হয় স্বাভাবিক জীবন-যাপন । সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে এই যে বিপর্যস্ততার ছাপ তার প্রভাব পড়ে বাংলা সাহিত্যেও । কারণ সাহিত্যের কাজই মানুষের জীবনের স্বরূপকে তুলে ধরা । বাংলা সাহিত্যের এমনই এক ক্রান্তি লগ্নে আত্মপ্রকাশ করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । হয়ত এ কারণে তাঁর সাহিত্যে বরাবরই আমরা পাই এক অন্য জগতের সন্ধান । দেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত যে বাংলা সাহিত্য ছিল এক অভিন্ন মাতার সন্তান পরমূহূর্তেই তা হয়ে যায় ভিন্ন মায়ের । বাংলা সাহিত্য তথাকথিতভাবে ভাগ হয়ে যায় দুটো ধারায় । কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের যে ধারা পশ্চিমবঙ্গে বইছিল সে ধারা তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণের হাত ধরে তার যৌবনে উপনীত হয়েছিল । কিন্তু পূর্ব বাংলার সাহিত্য তখন গুটি গুটি পায়ে সবে মাত্র তার যাত্রা শুরু করেছে। বিভাগ-পূর্ব কাল থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) যে কজন লেখক

তাঁদের সাহিত্য কৃতির পরিচয় রেখেছিলেন তাঁরা হলেন- মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান (আনোয়ারা), আব্দুল ওদুদ (নদীবক্ষে-১৯১৯), কাজী ইমদাদুল হক (আব্দুল্লাহ-১৯১৮), আবুল ফজল (চৌচির১৯২৭), হুমায়ূন কবির (নদী ও নারী- ১৮৪৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণ, শওকত ওসমান প্রমুখ । এই বিভাগ-পূর্ববর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের জীবনকে দেখার দৃষ্টি ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যায় । যথা-

১. জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস ।

২. সামন্ত জীবনমূল্যমান অতিক্রমের আন্তরিক প্রচেষ্টা ।

৩. বুর্জোয়া জীবনচিন্তা-স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে আস্থা ।

৪. সামাজিক দ্বায়িত্বচেতনা ।

৫. ভিক্টোরীয় প্রকরণরীতির অনুসরণ ।

৬. জীবন-অবলোকনে যথার্থ ইন্দ্রিয়জ বাস্তববাদে আস্থা ।

জীবনের যথাযথ রেখা, পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ,মাত্রা ও রঙে জীবনকে অবলোকন করতে চেয়েছেন বিভাগ-পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকেরা । কিন্তু সামগ্রিক জ্ঞান-অনুভূতি, বোধ ও অভিজ্ঞানকে তাঁরা চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় সংস্পর্শে চিত্রকল্পরূপে উদ্ভাসিত কিংবা পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পরোপুরি সক্ষম হন নি । এর কারণ, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণি তখনও ছিল অনভিজ্ঞ ও অপরিণত ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিস্তান ভেঙ্গে জন্ম নেওয়া স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে একজন । তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' প্রকাশ পায় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় । প্রথম উপন্যাস 'লালসালুর'-ও প্রথম সংস্করণ কলকাতায় প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকায় (১৯৪৯) । তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হল--

'বহিপীর' [নাটক] ঢাকা (লিখিত-১৯৫৫, প্রকাশিত- ১৯৬০)

'চাঁদের অমাবস্যা' [উপন্যাস] ১৯৬৪; ঢাকা

'উজানে মৃত্যু' (১৯৬৩) এটি কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি । এই একাঙ্কটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সমকাল' পত্রিকার ১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বাংলাদেশ থেকে ।

'সুড়ঙ্গ' [নাটক] ১৯৬৪; ঢাকা

'তরঙ্গভঙ্গ' [নাটক] ঢাকা (লিখিত-১৯৬২, প্রকাশিত১৯৬৫)

'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) ঢাকা

‘কাঁদো নদী কাঁদো’ [উপন্যাস] (১৯৬৮) মে, ঢাকা

এগুলো ছাড়াও ইংরেজিতে রচিত তাঁর আরো দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় । সেগুলো হল--

1. The Ugly Asian.

2. How does one cook beans.

এ দুটি রচনাই তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সম্পূর্ণ করেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করে যেতে পারেননি । গ্রন্থ দুটি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে বাংলাদেশের জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা ‘প্রথম আলোর’ ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । গ্রন্থ দুটির নিম্নোক্ত বাংলা নামকরণ করা হয়-

১. ‘দ্য আগলি এশিয়ান’- ‘কদর্য এশীয়’ -অনুবাদক - শিবব্রত বর্মণ, অবসর প্রকাশন ২০০৬, ঢাকা বাংলাদেশ

২.‘হাও ডাস ওয়ান কুক বিনস্’- ‘শিম কীভাবে রান্না করতে হয়’ - অনুবাদক - শিবব্রত বর্মণ, প্রথমা প্রকাশন ২০১২, ঢাকা বাংলাদেশ

দুটি গ্রন্থেই আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে জানতে পারি । মূলত তাঁর ‘কদর্য এশীয়’ পুরোপুরিভাবেই এক রাজনৈতিক উপন্যাস । তিনি বলেছেন উপন্যাসে বর্ণিত দেশটি হতে পারে এশিয়ার যে কোন একটি কল্পিত দেশ । কিন্তু গ্রন্থটি কিছুটা পড়ার পরেই আমরা বুঝতে পারি সে কল্পিত দেশটির নাম বাংলাদেশ -যার জন্মই হয়েছে ঔপন্যাসিকের মৃত্যুর পরে । আরো লক্ষণীয়, দেশের রাজনীতিই কাহিনির মুখ্য প্রতিপাদ্য নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্কের বিন্যাস ও আভ্যন্তরীণ উৎকণ্ঠা উন্মোচন এর মূল লক্ষ্য । অপরদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ‘শিম কীভাবে রান্না করতে হয় ’ বা ‘হাও ডাস ওয়ান কুক বিনস্’ উপন্যাসটির উপশিরোনাম-‘এক এশীয়র ফ্রান্স অভিযান’ । ‘কদর্য এশীয়’-সহ ওয়ালীউল্লাহ্র অন্যান্য তিন উপন্যাসের সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য এই যে এটি মূলত চটুল ভঙ্গিতে লেখা । এর মূল চরিত্র এক প্রাচ্যবাসী, আবার গল্পের কথকও তিনি । এক আলিশান এশিয়ান হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে প্রাচ্যবাসী দেখলেন, এক ফরাসি ভদ্রলোক ওয়েটারকে ধমকে বলছেন, শিম এভাবে রাঁধতে হয় না, শেফকে ডাকুন । হন্তদন্ত হয়ে হোটেলের শেফ আসলেন । ফরাসি ভদ্রলোক তাকে শিম রান্নার কৌশল বাতলে দিলেন । কিন্তু কিছুটা দূরে থাকায় প্রাচ্যবাসী তার কিছুই বুঝতে পারলেন না । তিনি আকস্মিকভাবে ঠিক করলেন, যে দেশের মানুষ সঠিকভাবে শিম রান্না করতে পারেন তাঁকে সেই দেশে যেতে হবে । উপন্যাসটির

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই ফরাসি দেশে অভিযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক । এ উপন্যাসে লেখক একজন প্রাচ্যবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমের একটি দেশকে হাজির করেছেন এক উদ্ভট চেহারায়, এর বাইরের ভব্যতার চামড়াটির খোলস ছাড়িয়ে দিয়ে । পাশ্চাত্যবাসীকে হুল ফোটাতেও ভোলেননি তিনি । এভাবে স্রষ্টা হিসেবে উপন্যাস দুটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পাই । যিনি এক অচেনা শিল্পী, এতদিন যাকে আমরা জানার সুযোগ পাইনি ।

প্রধানত, ছোটগল্পের হাত ধরেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যিক যাত্রার শুরু । তাঁর অগ্রন্থিত গল্পসমূহের অধিকাংশই এই প্রস্তুতিপর্বে রচিত হয়েছে । এ পর্যায়ের গল্পগুলোতে তাঁর মনোযোগ প্রধানত নিবদ্ধ থেকেছে হালকা রোমান্টিকতায়, একই সঙ্গে শব্দের ব্যবহার ও বর্ণনার কৌশলেও সঞ্চারিত করেছেন এক ধরনের কাব্যিক মাধুর্যতার । ‘সীমাহীন এক নিমেষে’, ‘চৈত্রদিনের এক দ্বিপ্রহরে’, ‘ঝোড়ো সন্ধ্যা’, ‘পথ বেধে দিল..’, প্রবল হাওয়া ও ঝাউ গাছ’, ‘স্বপ্ন নেবে এসেছিল’, ‘সবুজ মাঠ’, ‘অবসর কাব্য’, ‘রক্ত ও আকাশ’, ‘না কান্দে বুবু’ প্রভৃতি গল্পের নামকরণেই ফুটে উঠেছে এই কাব্যিকতার সহজ অনুসরণ । রবীন্দ্র রচনারীতির প্রভাব তাঁর এই পর্যায়ের রচনায় অনেকটাই লক্ষ্য করা যায় । এছাড়া তাঁর এ পর্যায়ের গল্পগুলোর ভাষায় কলকাতার ‘ডায়লেক্ট’ লক্ষ্য করা যায় । যেমন, করলুম, বললুম, উঠলুম, বললে, করলে ইত্যাদি । এছাড়াও তাঁর এ পর্যায়ের গল্পগুলোর ভাষায় ঈষৎ শিথিলতাও রয়েছে । বিশেষত ক্রিয়ারূপের ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব ভাবপ্রকাশের কৌশল প্রায় ক্ষেত্রেই অনধিগত । তবুও রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছের বিষয়, আঙ্গিক কিংবা ভাষাগত শিল্পসৌকর্যতায় যথেষ্ঠ আন্তরিক এবং সৃষ্টিধর্মী । ওয়ালীউল্লাহ্‌র ‘সীমাহীন এক নিমেষে’, ও ‘চিরন্তন পৃথিবী’ ব্যক্তির নিঃসঙ্গ-চেতনা এবং পরিবেশের গভীরে অবস্থান করেও পরিবেশ-ঊর্দ্ধ-অধিবাস্তব পরিমন্ডলে তাঁর আত্ম-উত্তরণের রূপালেখ্য নির্মিত হয়েছে । ‘চৈত্রদিনের এক দ্বিপ্রহরে’ গল্পে উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর আত্যন্তিক স্বজাতি-নিষ্ঠার পরিচয় ।‘ঝোড়ো সন্ধ্যা’ ব্যক্তির দূরাভিসারী কল্পনার সকরুণ পরিণতিরই খর চিত্র । আবার মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি অভিন্ন করে উপস্থাপন করেছেন ‘মানুষ’ গল্পে । বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানের অবসর তাঁর প্রথম পর্বে নেই । এ-পর্বে তাঁর প্রতিভা ও জীবনবোধ গঠনশীল ও স্ফুটনউন্মুখ ।

প্রকৃতপক্ষে 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থ থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের শিল্পিসত্তা একটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে । এ পর্বে তিনি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র-মানসের ঘটনাবর্তে আলোড়িত হয়েছেন এবং নিজস্ব সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়ণে আন্তরিক হয়েছেন । 'নয়নচারার' গল্পগুলো সে অর্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনাস্রোত, অনুভূতি, অন্তঃকরণ এবং কাল ও সমাজ-সচেতন মনস্ক্রিয়ার অনুকৃতি ও শিল্প-অভিজ্ঞান ।

বিষয়-বিবেচনা এবং স্রষ্টার অনুভাবনা অনুযায়ী এ পর্বের গল্পগুলোকে আমরা প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি । যার প্রথম ভাগে-'নয়নচারা', 'মৃত্যুযাত্রা', 'রক্ত', ও 'সেই পৃথিবী' এবং দ্বিতীয় ভাগে-'জাহাজী', 'খুনী', ও 'পরাজয়' । প্রথম ভাগের গল্পে রূপায়িত হয়েছে সমকালের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের যন্ত্রণা, আর্তি ও বিষন্নতা আর দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পগুলোতে মূলত রয়েছে পূর্ববাংলার মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের জীবন স্বরূপ, তাদের নিরানন্দ ও প্রত্যাশাদীপ্ত জীবনের বাস্তবভিত্তিক কাহিনি । কার্যত 'নয়নচারা' থেকেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষাচিন্তায় পরিমিতিবোধ এবং শিল্পসৌকর্যতার শুরু । এ পর্যায়ে তাঁর অধিকাংশ গল্পের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে পূর্ববঙ্গের গ্রাম এবং গ্রামীণ সমাজজীবন থেকে । কিন্তু সেই গ্রামীণ জীবনের অভিব্যক্তির বর্ণনায় তিনি হয়ে উঠেছেন ব্যতিক্রমী । ব্যক্তিক এবং সামাজিক সমস্যাবলীর পাশাপাশি ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্গত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই তাঁর এ পর্যায়ের গল্পগুলোর প্রধান আকর্ষণ । ফলে 'নয়নচারা'-র প্রতিটি গল্পই কাব্যিক কিংবা শাব্দিক গঠনে পূর্বের চাইতে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী, ব্যঞ্জনাময়, সাংকেতিক এবং বিশ্লেষণ প্রধান ।

'লালসালু' ওয়ালীউল্লাহের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস । লেখকের মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে উপন্যাসটি রচিত হয় । আমরা অনেকেই হয়ত জানি না উপন্যাসটি একটি বাস্তব ঘটনাকে আধার করে রচিত । আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের এক স্মৃতিচারণা থেকে-

''.....একটি উপন্যাসের বিষয় নিয়ে অনেক দিন ধরে ভাবছি । একজন গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ যার সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সে ব্যাবসা হিসেবে বেছে নিল কবর পূজা । .....চট্টগ্রামে আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল । একজন লোক হঠাৎ উঁচু একটা মাটির ঢিবির ওপর চুনকাম করে তার ওপর লাল শালু বিছিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে পয়সা নিতে লাগল । .....এরকম এক ব্যাবসায়ীর চাতুর্যকে আমি

আবিষ্কার করতে চাই, আবার মমতার মধ্যেও তাকে পেতে চাই ।এটা কি করে সম্ভব হবে আমি জানি না কিন্তু আমি চেষ্টা করছি ।''[১]

তাঁর সেই প্রচেষ্টারই ফসল 'লালসালু' । যার নায়ক এক ভন্ড ধর্মব্যবসায়ী । নাম তার মজিদ । সে গারো পাহাড় এবং মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ পেরিয়ে আসে মহব্বতনগর নামে এক সমৃদ্ধ গ্রামে । পরবর্তীতে সেই গ্রামের এক পরিত্যক্ত, অবহেলিত, কবরকে কেন্দ্র করে ঘাঁটি গেড়ে বসে । আর প্রচার করে কবরটি 'মোদাচ্ছের পীর' নামক এক মহান পীরের মাজার । শুরু হয় তার ধর্মব্যাবসা । তবে 'লালসালু'-কে যদি শুধুমাত্র এক ভন্ড পীরের কাহিনি হিসেবে মনে করা হয় তবে তা ভুল । কারণ এই উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে শুধুমাত্র মজিদের মত ভন্ড ধর্মব্যবসায়ীর চিত্রই ধরা পরেনি একই সঙ্গে উঠে এসেছে পূর্ব-বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের বিচিত্র জন-জীবন এবং তার নৈসর্গিক অঞ্চল ।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু'-উপন্যাসে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের রূপ-বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যমন্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে । এ সময়ই বিভাগোত্তরকালে গ্রামীণ সমস্যাভিত্তিক আরো কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয় । এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হল -শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫), শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬৮), আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী'(১৯৫৫), শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৬১) ইত্যাদি । ন্যারেটিভ রচনাভঙ্গি এ-উপন্যাসগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । যেমন--

''অকালে কোত্থেকে খাজনা দেব ? কেমন অসহায় ভাবে বলল কসির । খাজনা দেব না, ভিটিও ছাড়ব না, দেখি কি করতে পারে। মিয়ার 'পুত' । যেন কসিরের অসহায়তারই প্রতিবাদে বলল লেকু । চমকে ওঠে সেকেন্দার মাস্টার । বলে কি লেকু ? ওরা খুঁজছে একটা ভদ্রস্থ রফা । কিন্তু লেকুর মত গোয়ার্তুমি দেখালে তো যে কোন রফারই দফারফা ।

ওই শুয়রের জাত রমজান, সব তারই শয়তানী । সে ব্যাটাই বুদ্ধি দিয়েছে মিঞাকে । আমাদের 'গেরাম' ছাড়া করবে এই তার মতলব ।ফুলে ফুলে উঠে লেকুর ঘাড়ের পেশীগুলো।

ওরা কেউ ভাবেনি অমন আচমকা নোটিশ দিয়ে বসবে ফেলু মিঞা । মাঘ ফাল্গুন কৃষকদের ঘরের কাজের সময় । এই দুটো মাসে সেরে ফেলতে হয় সারা বছরের বকেয়া কাজ। এ সময় আবহাওয়াটা থাকে ওদের অনুকূলে, বৃষ্টি নেই, প্যাঁক নেই, শীতের নির্মল রোদ-ঝকঝক আবহাওয়া, কাজ করে শ্রান্ত হয় না ওরা । ফসল তোলা শেষ করেই হাজার গন্ডা টুকিটাকি কাজে মন দেয় : মন্থর অবসরে হাত-পা ছড়িয়ে ছন বাছে, ছোট বড় নানা

আকারের গুচ্ছ বেঁধে বেঁধে তুলে দেয় চালের উপর, দেখতে দেখতে ঘরের উপর ওঠে নতুন ছাউনি । ভাঙ্গা বেড়াগুলো মেরামত করতে হয়, পাল্টাতে হয় বর্ষার উইয়ে খাওয়া চালা । ডোবাটার প্যাঁক তুলে আর একটু গভীর করে রাখতে হয় যাতে বর্ষার পানির সাথে মাছ পড়ে আবার পালিয়ে না যায় । এ সব কাজে টাকা লাগে । এমন সময় বকেয়া খাজনার নোটিশটা বাজের মতো পড়েছে ওদের মাথায় ।''[২]

এ পরিমন্ডলে 'লালসালু' এমন এক গ্রাম্যতা বর্জিত উপন্যাস যা আমাদেরকে গ্রামের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করে । উপন্যাসটি ধর্মীয় ভন্ডামির বিরূদ্ধে এক কালজয়ী সৃষ্টি । টুপি, খৎনা, মাজার-ব্যবসা, পীরগিরি কিংবা আম-মৌলবির দাড়ি, ধর্মের যা কিছু বাহ্যিক রূপ তার কোন কিছুকেই তিনি রেহাই দেননি । বাংলাদেশে শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন বা শহীদুল্লা কায়সার প্রমুখের লেখায় সমাজ সংস্কারের একটা চেষ্টা দেখা যায় । কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখায় সেই সচেতন প্রয়াস নেই । তবুও তাঁর লেখার ভঙ্গিমাতেই তৈরি হয়েছে এক শিল্পসম্মত প্রতিবাদ । যা ওয়ালীউল্লাহ্‌র সহজাত ক্ষমতা । যেমন 'লালসালু' উপন্যাসের শুরু করেছেন তিনি এভাবে--

''শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে । ঘরে কিছু নেই । ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ । দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে - প্রদেশেরও । হয়তো-বা আরো দূরে । যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না । জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা - শূন্য মুখথোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা । দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির শামিল । তাই তারা ছোটে, ছোটে ।

.....

সত্যি শস্য নেই । যা আছে তা যৎসামান্য । শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি । ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতালার বি'শেষ দেশ ।''[৩]

এখানে লেখকের কৃতিত্ব তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতায়, দ্বিধাহীন বক্তব্যে এবং জীবনদৃষ্টির ভিন্নতর অভিব্যক্তিতে বিধৃত । 'লালসালু' উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদৃষ্টি শুধু আধুনিক নয় বলা যায় আধুনিকতম । কারণ তিনি ইউরোপীয় উপন্যাস শিল্পের একটি সাম্প্রতিকতম ধারাকে আবহমান কালের বাংলার গ্রামীণ প্রতিবেশে উপস্থাপন করেছেন ।

'লালসালুর' সাত বছর পর প্রকাশিত হয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক 'বহিপীর' (লিখিত-১৯৫৫, প্রকাশিত-১৯৬০) । প্রকাশকাল এবং শিল্পরূপের ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি রচনাতেই তিনি অভিন্ন প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেছেন । এ দেশীয় সমাজ-চৈতন্যকে স্পর্শ করেও আধুনিক ব্যক্তিমনের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন । তবে 'লালসালুর' মত সুবিস্তৃত ক্যানভাস 'বহিপীর'- এ নেই । এ নাটকে মাত্র ছ'টি চরিত্রের সাহায্যেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর নাট্য-প্রতিভার নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪)। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাসের মধ্যে ব্যবধান চৌদ্দ বছর । কাহিনি-গ্রন্থন, বিষয়বস্তু নির্বাচন, উপন্যাসের আভ্যন্তর পরিচর্যা ও অন্তর্বয়ন-সব দিক থেকেই 'চাঁদের অমাবস্যা' 'লালসালু' থেকে প্রাগ্রসর ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরীক্ষাপ্রিয়তা ও তাঁর ক্রমসাফল্যের পরিচয়ে উজ্জ্বল ।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (লিখিত-১৯৬২, প্রকাশিত১৯৬৫) বাংলা নাটকের সংগঠন জিজ্ঞাসার লৌকিক ধারায় স্বাতন্ত্র চিহ্নিত এবং ইয়োরোপীয় আধুনিক নাট্য-আন্দোলন দ্বারা পরিমার্জিত এবং পরিস্নাত। বক্তব্য বিবেচনায় নাটকটি অনেকটাই ওয়ালীউল্লাহ্‌র শেষ উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো'-র সমধর্মী ।

'নয়নচারা' পর্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ বিবিধ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে ব্যক্তিকে তার পূর্বাবস্থান ও বর্তমান জীবনের দ্বন্দ্বময় পটভূমিতে স্থাপন করে নির্মাণ করেছেন । আর 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' পর্যায়ের গল্পগুলির অন্তর্বয়ন, পরিচর্যা, সংগঠনেও তিনি সতর্ক যত্নশীল ও পরীক্ষাপ্রবণ। এ পর্যায়ের গল্পগুলিতে ঘটনাই প্রধান এবং অধিকাংশ চরিত্রই বিবিধ বিচ্ছিন্নতা-চেতনায় আচ্ছন্ন হওয়ায় গল্পের অভ্যন্তরে এসেছে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র, স্বতন্ত্র রীতি ও কৌশল। পাশাপাশি ব্যক্তিচরিত্রের স্তরবহুল মনের জটিল এবং নিগূঢ় উপলব্ধির প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে 'দুইতীর ও অন্যান্য' গল্পের বাক্যগঠনেও এসেছে জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতা । মোটকথা এ পর্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টিশীল ভাষার প্রাজ্ঞতায় আরও বেশি সংযমী, সংবেদনশীল এবং পরীক্ষাপ্রবণ ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মার্সেল প্রুস্ত, ডরোথ রিচার্ডসন, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্‌ এবং উইলিয়াম ফকনারের মত যেসব ব্যক্তিত্বগণ চেতনাপ্রবাহরীতি নামক এক নতুন সাহিত্য রীতির সূচনা করেন বাংলা সাহিত্যে সেই ধারার অন্যতম বাহক হিসেবে স্বীকৃত মাত্র কয়েকজন-ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ।

গোপাল হালদারের তিন খন্ডে সমাপ্ত উপন্যাস একদা, অন্যদিন, আর একদিন বা সংক্ষেপে 'ত্রিদিবা'-কে চেতনাপ্রবাহমূলক প্রথম উপন্যাস হিসেবে ধরা হলেও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস- 'অন্তঃশীলা, আবর্ত এবং মোহনা'-য় এর সার্থক প্রকাশ ঘটে । ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে জেমস জয়েস, ডরোথি রিচার্ডসন, মার্সেল প্রুস্ত প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকের প্রভাব রয়েছে । উপন্যাসে বার বার খগেন বাবুর সংলাপে উঠে এসেছে - জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর কথা, মার্সেল প্রুস্ত এর নাম ও রচনা প্রসঙ্গ । ১৯৩৫ সালে 'অন্তঃশীলা' যখন প্রকাশ পায় তখন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তার একটি দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন যেখানে তিনি বলেছেন --

'' বইখানির গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক না হলেও, বঙ্গসাহিত্যে নতুনতর। Virginia Woolf এর Mrs Dalloway - এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।''

স্বয়ং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও একথা স্বীকার করে নেন । ওই সমালোচনার উত্তরে সরস ভঙ্গিতে লেখেন--

''আবার বলি, বইখানিতে চিন্তার চেয়ে তার সংযোগই অনুধাবনযোগ্য । এ ক্ষেত্রে প্রুস্ত ও উলফ-এর পন্থাই লেখকের একমাত্র পন্থা । খগেন Intellectual giant মোটেই নয় । এযুগের Intellectual type মাত্র, যার মননক্রিয়া বিশুদ্ধ নয়, স্মৃতি এবং ভাবমিশ্রিত ।''

ইন্দিরা দেবী এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই দুটি রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল 'চিত্রালী' পত্রিকার মাঘ ১৩৪২ সংখ্যায় । যতই বিদেশি প্রভাব থাক না কেন বাংলা চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির উপন্যাসের ধারায় এই ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' এবং 'মোহনা'-র স্থান অত্যন্ত উচ্চে । একজন খাঁটি ঔপন্যাসিকের মতই তিনি উপন্যাসের রীতিকেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন ।

আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই ধারারই একজন ব্যতিক্রমী রূপকার । বস্তুত আধুনিক, মননশীল এবং মেধাবী সাহিত্যিক পরিবৃত্তে চেতনাপ্রবাহরীতির এক সম্পূর্ণ এবং সফল শিল্পরূপায়ন তাঁর 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাস । তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা-আরেফ আলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, তবারক ভুইঞা, সাকিনা কিংবা কুমুরডাঙ্গার অপরাপর বাসিন্দাদের কেউই উচ্চশিক্ষিত কিংবা আধুনিক শ্রেণি সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়, এরা আমাদের অতি চেনা দেশজ এবং লোকজ-প্রভাব ও পরিবেশ-লালিত । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চেতনাপ্রবাহ রীতির

মতো একটি জটিল, আধুনিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে প্রধানত মূর্ত করতে চেয়েছেন এদেরই অন্তর্গত বিশ্বাস, সংস্কার, হতাশা, ক্ষুব্ধতা এবং নিঃসঙ্গতার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ।

শুধু উপন্যাসই নয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অধিকাংশ ছোটগল্পেও আংশিকভাবে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । প্রথম রচনা 'সীমাহীন এক নিমেষে' থেকেই চরিত্রের মানসলোক এবং তার অন্তর্জগতের কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে । পরবর্তীতে রচিত 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের 'নয়নচারা', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'খুনী', 'রক্ত', 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প'-গ্রন্থের 'দুইতীর', 'পাগড়ি', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'স্তন', 'মতিউদ্দিনের প্রেম', অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছের 'মানুষ', 'স্থাবর', 'না কান্দে বুবু' ইত্যাদি গল্পগুলোতে চেতনাপ্রবাহ রীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় ।

এভাবে প্রথমে ছোটগল্প, তারপর উপন্যাস এবং সবশেষে নাটক - এই ক্রমে মাধ্যমগুলিতে অগ্রসর হয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ । কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনায় এক অখন্ড ও অবিভাজ্য ওয়ালীউল্লাহ্‌ই প্রকাশিত । সব মিলিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ একজন নিবিড় গদ্যশিল্পী ; কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখলেও তিনি প্রাবন্ধিক নন । আবার গল্প ও নাটক লিখলেও গদ্যশিল্পী হিসেবে তিনি গহন পথের যাত্রি । ভাষা শিল্পী হিসেবে তাঁকে নির্দিষ্ট কোন ছকে ফেলে মাপা যায় না । পরীক্ষাশীলতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাকর্মের এক প্রধান চারিত্রলক্ষণ । সমসাময়িক লেখক শওকত ওসমান যথার্যই ব্যাখ্যা করে বলেছেন--

''বহুকাল প্যারিস প্রবাসের ফলে সৈয়দের রচনায় কন্টিনেন্টাল নানা তরঙ্গের অভিঘাত পাওয়া যায় । ফরাসি অস্তিত্ববাদীদের প্রভাব আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর বেশ কিছুদিন আচ্ছন্নতা বজায় রেখেছিল । কিন্তু তার ফলে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তের অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে ।''[৪]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর নিজস্বতায়, অপার ঐকান্তিকতায় দেশজ আবহ এবং অভিজ্ঞতার পরিশীলিত সম্মিলনে নির্মাণ করে নিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের সুচারু পরিমন্ডল । তাঁর নির্বিরোধ সৃষ্টি সচেতনতা তাকে বারংবার পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে জীবন ও জগতে ভাবসৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনে । তাঁর সৃষ্টির আধুনিকতা, দৃষ্টির স্বাতন্ত্র আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায়, জীবনের অভ্যন্তরে তাকাতে তাগিদ দেয় । তাই তাঁকে শুধু শ্রেষ্ঠ বলা যথেষ্ট নয় বরং বলা যেতে পারে যে, সমকালীনদের মধ্যে তিনি হলেন সবচাইতে সম্পন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যশিল্পী ।

একজন সাহিত্যিক তাঁর দেশ, দেশের মানুষ তথা গোটা পাঠক সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির মননশীল প্রয়োগ নৈপুণ্যের কাছে। এই প্রেক্ষিত থেকেই বেরিয়ে আসা সম্ভব একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিকবোধের । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই নিরীখে বিচার্য একজন দ্বায়িত্বসচেতন, আধুনিক এবং জীবনমুখী চিন্তাশীল কথাশিল্পী হিসেবে । মাত্র পঞ্চাশ বছরের আয়ু বরাদ্দ ছিল তাঁর জন্য, তবু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লেখক-গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার । অধিকাংশ বাঙালি পাঠকই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে এক ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার হিসেবে জানলেও অনেকে একথা জানেন না যে একজন নাট্যকার হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয় । তবে স্বল্পায়ু জীবনে খুব বেশি নাটক তিনি লিখে যেতে পারেন নি। মাত্র চারটি নাটকের মধ্যেই তাঁর নাট্য কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ থেকে গেছে । নাটকগুলো হল--

১. বহিপীর (১৯৬০)

২. তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬২)

৩. সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)

৪. উজানে মৃত্যু (১৯৬৩)

'বহিপীর' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের প্রথম নাটক । ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হলেও মূলত এর রচনাকাল ১৯৫৫ । নাটকটি পি.ই.এন ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলা' নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন এবং দ্বিতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। 'বহিপীর' সম্পূর্ণ এক অস্তিত্ববাদী নাটক। ঠিক তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির মতই । চাঁদের অমাবস্যা'-র নায়ক আরেফ আলী এবং 'বহিপীর' -এর নায়ক বহিপীর দুজনেই অস্তিত্ববাদী চরিত্র। অস্তিত্ববাদের যে তিনটি মূল সূত্র-কর্ম, দায়িত্ব ও আত্মমুক্তি-তা আমরা লক্ষ্য করি বহিপীর এর জীবনে । যে তরুণী তাহেরাকে আয়ত্ত করবার জন্য বহিপীর বিবিধ কৌশল প্রয়োগ করেছেন, নাটকের শেষে তিনিই তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়েছেন । মেনে নিয়েছেন নতুনের ও তারুণ্যের প্রবাহকে । বহিপীর এর শেষ সংলাপে আছে শমশান্তির সেই স্বাক্ষর --

''বহিপীর- ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন ।

[ততক্ষণে হাশেম তাহেরার হাত ধরে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে । তাহেরার চলাটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সে বিশেষ বাধা দেয় না । কেবল বলতে থাকে, কোথায় যাব?

কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? এ-ঘরে বহিপীর ব্যতীত আর সবাই বিমূঢ় হয়ে থাকে ।]

বহিপীর- (দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে) এতক্ষণে ঝড় থামিল । তাহারা গিয়াছে, যাক । তাছাড়া-তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না ।তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই ।আজ না হয় কাল যাইবেই ।''[৫]

তাহেরাকে মুক্তি দেবার পাশাপাশি বহিপীর হাতেম আলী সাহেবের জমিদারি রক্ষার দ্বায়িত্বও গ্রহণ করেছেন । কর্মে, দ্বায়িত্বে ও আত্মমুক্তিতে বহিপীর একজন পরিপূর্ণ অস্তিত্ববাদী মানুষ বলেই নাটকের শেষে জমিদার পত্নীকে ভরসা দিয়ে বলতে পারেন--

''বহিপীর - (হেসে) তওবা তওবা । এত বিচলিত হইবার কি আছে ? আমরা সকলে -তো রহিলাম । আমরা থাকিব; আপনার জমিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব । চিন্তার কী কারণ ?''[৬]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬২) । তাঁর 'বহিপীর' এবং 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটক দুটি অনেকাংশে একে অপরের পরিপূরক। কারণ 'বহিপীর' যতখানি বহির্বাস্তবতাপ্রধান নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' ঠিক ততটাই অন্তর্বাস্তবতা মূলক নাটক । 'বহিপীর'-এ একটি আশার কুচি হীরের মত শেষ পর্যন্তও জ্বলজ্বল করে । সামাজিক দায়ভার ব্যক্তির মধ্য দিয়ে শোষিত হওয়ার যে আশা 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে দেখা যায় তার ক্ষীণতম লক্ষণটুকুও এক্ষেত্রে নেই। চোখ বন্ধ থাক বা খোলা, সমাজের ছক বাঁধা নকশায় কোনো পরিবর্তন এ নাটকে ঘটে না । সরকার পরিবর্তন হয়। রাজনীতিকেরা স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুতবেগে মত বদল করেন, কিন্তু সমাজব্যবস্থার এক তিল পরিবর্তন করতে পারেন না । আমেনার মত যেসব জননী নিরুপায় হয়ে শিশুকে হত্যা করে তাদের ঠিকই ফাঁসি হয়ে যায় । কেউ তাদের রক্ষা করতে পারে না। প্রকৃতার্থে 'তরঙ্গভঙ্গ' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অনেক পরিণত মনের ফসল । ঘটনা সংকলনে, নাট্যিক মুহূর্তে এক্ষেত্রে শৈল্পিক মাত্রা যেভাবে এসেছে তাঁর অন্য কোন নাটক তাকে ছুঁতে পারে নি ।

তবে মানসিকতার দিক থেকে বিচার করলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি ব্যতিক্রমী ও ভিন্নস্বাদের নাটক 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪) । নাটকটি যে মূলত অল্পবয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত হয়েছে তা তিনি নাটকটির শুরুতেই এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন--

''নাটকটি প্রধানত কিশোর-কিশোরিদের জন্যে লেখা । তবে তরুণমন বয়স্করা-যারা সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, তারা এটি পড়ে বা দেখে আমোদ বোধ করবেন বলে আশা রাখি ।''[৭]

সমগ্র নাটকের কথাবস্তু গড়ে উঠেছে রেজ্জাক সাহেবের কন্যা রাবেয়াকে আশ্রয় করে । যে নিজের ঘরে গুপ্তধনের রহস্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যে বিবাহের দুদিন পূর্বে রুগী সেজে সারাক্ষণ নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে থাকে । কাহিনি বিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর নিরীখে নাটকটিতে অসাধারণ কিছু না থাকলেও এর সাফল্য ধারণ করে আছে মূলত এর চরিত্রসমূহ এবং তাদের সংলাপ । কিশোর কিশোরিদের জন্য রচিত হয়েছে বলে সমগ্র নাটকের সংলাপে রয়েছে এক সহজাত বোধ । যাতে সকলেই খুব সহজেই তা পড়ে বুঝতে পারে । এছাড়া অতি পরিচিত শব্দ ব্যবহার, সরল বাক্য সৃষ্টি, সাধারণ দৃশ্য যোজনা হলেও এ ভাষার মধ্যে লুকিয়ে আছে অ্যাবসার্ড উপাদান, আপাত বিচ্ছিন্ন ভাব, অনাত্মীয় এক পরিবেশ--

''কলিম-(চারধারে সন্তর্পণে তাকিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে) এখনো চোখ নিমীলিত, নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না । অথচ তুড়ি বাজালে চোখ কাঁপে । কিন্তু তুমি ঘুমাও । তোমার গায়ে পালকের আঁচ পর্যন্ত পড়বে না । তুমি ভান করছ, আমিও ভান করছি । দু-জনের কর্মপন্থা এক, অথচ উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন । অতএব দু-জনের স্বার্থে সংঘর্ষ হবার কোন কারণ নাই । একজন চোখ বুঁজে শুয়ে থাকবে, আরেকজন আপন মনে কাজ করে যাবে। [কলিম পকেট থেকে একটা নক্‌শা বের করে পড়ে, এদিক-ওদিক তাকায়, হেঁটে-হেঁটে কী মাপে, লাঠি দিয়ে এখানে-সেখানে ঠোকে, মাথা নাড়ে থেকে থেকে, রাবেয়া একটু উঠে কৌতূহলভরে ফকিরের দিকে তাকিয়ে থাকে তার অজ্ঞাতে।]

রাবেয়া-তিনটে নয় ।

কলিম- (চমকে উঠে) কে! ও।

রাবেয়া- (ফিক করে হেসে)তিনটে নয়, চারটে ।

কলিম- (কিছুটা বিরক্তির ভাব করে) কী চারটে ?

রাবেয়া-দাঁত । পোঁকা-পড়া দাঁত ।

কলিম-ও । (নক্‌শা পড়ে) ।

রাবেয়া-সেটা বড় কথা নয় । কেন, আমার নানির দশ-দশটা দাঁতে পোকা ছিল, তবু নানা-নানি কখনো ঝগড়া করেন নি । আসল কথা আপনি ফিকিরে ফকির । মানে, ফকিরের সাজে কিছুর ফিকিরে আছেন ।

কলিম-না না, আমি ফকির, মস্ত ফকির । তবে একটু অদ্ভুত ধরনের । তুমি বুঝবে না ।

রাবেয়া-আরেক কথা । আব্বার হার্টের আর ব্লাড-প্রেসারের গোলমাল-তো আছেই, চোখেও আছে । শুধু বড়াই করে বলেন যে বাজপাখির মতো তাঁর দৃষ্টি ।

কলিম- (আবার মেঝে মাপতে-মাপতে অন্যমনস্কভাবে) কেউ নিজের দোষ স্বীকার করে না ।

রাবেয়া- আমি সে-কথা বলছিলাম না । বলছিলাম যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি সত্যই যদি বাজপাখির মত চোখা হত, তাহলে তিনি আপনাকে ঠিক চিনতেন ! আমি-তো চিনেছি । সেই হাঁটা, সেই গলা, সেই নাকের আওয়াজ ।

কলিম- (সচকিত হয়ে তার দিকে চেয়ে) কী বাজে কথা বলছ ?

রাবেয়া- আমার শ্রদ্ধেয় চাচাতো ভাই কলিমুদ্দিন যিনি আজ পাঁচ বছর ধরে শহরবাসী, তাঁকে চিনতে পারব না ? আরে, কোথায় যাচ্ছেন কলিম ভাই, ভয় পেলেন নাকি ?''[৮]

'সুড়ঙ্গ'- নাটকে এধরনের সংলাপ, আবহের উপস্থিতি খুব বেশি নয়, শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু অংশেই তা সীমাবদ্ধ । কিন্তু এই পরিচর্যাই প্রমাণ করে যে, নাট্যকার হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সবসময়েই ব্যতিক্রমি হয়ে ওঠার সাধনা করেছেন । আন্তর্জাতিক নাট্য-পরিধিকে স্পর্শ করাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রেষণা, তাঁর প্রাণচঞ্চল সত্তার স্বাভাবিক প্রবণতা ।

অপরদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'উজানে মৃত্যু' বাংলা নাট্য সাহিত্যে এক বিরল ও নিঃসঙ্গ সৃষ্টি । 'বহিপীর'-এর মাধ্যমে যে নাট্য যাত্রার সূচনা হয়েছিল 'উজানে মৃত্যু'-তে এসে তা হয়েছে বিশ্বপ্রসারী । এই একাঙ্ক নাটকটিতে চরিত্র মাত্র তিনটি । নৌকাবাহক, সাদাপোশাক পরিহিত এবং কালো পোশাক পরিহিত দু-জন ব্যক্তি । নাটকটিতে নৌকাবাহক অর্থাৎ একজন গুনটানা মাঝিই 'উজানে মৃত্যু'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র । 'চাঁদের অমাবস্যার' আরেফ আলীর মত এই মাঝিও একই সঙ্গে অস্তিত্ববাদী এবং নিয়তিবাদী । অস্তিত্বের যন্ত্রনাই তাকে নিয়তিবাদী করে তুলেছে । অন্য দুটি চরিত্র-সাদা পোশাকধারী ও কালো পোশাকধারী নৌকাবাহক চরিত্রকেই করে তুলেছে উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট । সাদা পোশাকধারী বিশ্বাসী, সে প্রাণপণে চেষ্টা করে দুর্ভাগা নৌকাবাহকের অস্তিত্বকে অর্থবান করে তুলতে--

''সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি - (অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ায় এবং দুঃখভরে মাথা নেড়ে) তুমি সত্যিই পাগল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আমি তোমাকে সাহায্য করছি শুধু এই কারণে যে, তোমার বুকে অনেক দুঃখ । এ-সব সময় কেউ বাড়াবাড়ি করলেও সহ্য করতে হয় । কিন্তু তোমার দুঃখটা কিছু পড়লে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে ।''[৯]

অপরদিকে কালো পোশাকধারী অবিশ্বাসী ব্যক্তি চারধারে কেবল অর্থহীনতাই দেখতে পায় । আর সেই অর্থহীনতা সে নৌকাবাহককেও দেখাতে চায়--

''সাংঘাতিক লোক । চারধারে অর্থহীনতা, তবু তার কাছে কিছুই অর্থহীন নয় । তার বিশ্বাসকে অটুট রাখার জন্যে সে সবকিছু করতে প্রস্তুত । এমন কি তার প্রিয়তম বন্ধুকেও মৃত্যুর দরজায় টেনে নিতে তার বাধবে না ।''[১০]

আবার এই কালো পোশাকধারী ব্যক্তিই বলে--

''অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন ? আপনার পোশাক সাদা, আমার কালো। কিন্তু তাতে কী আসে যায় ? আসলে সব রঙই ভুয়ো ।''[১১]

কিন্তু এ তার সর্বাত্মক বিনাশী ভাবনারই পরিচায়ক । নাট্যকার সাদা ও কালো পোশাক দিয়ে ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে যথাক্রমে বিশ্বাস ও সক্রিয় এবং অবিশ্বাস ও নিষ্ক্রিয়তার রঙ লাগিয়েছেন । সমগ্র আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের নাট্যপ্রতিভা একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । মঞ্চ পরিকল্পনার বৈচিত্র্য এবং স্বদেশীয় সমাজ কাঠামোর অন্তরালে আধুনিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মূলত ন্যাচারালিষ্ট । 'তরঙ্গভঙ্গে'-সেই একই জীবনবোধে প্রত্যয়দৃঢ় হয়ে নাট্যকার হিসেবে তিনি এক্সপ্রেশনিষ্ট আবার 'উজানে মৃত্যু'-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পূর্বাপেক্ষা আরো প্রাগ্রসর, বৈশ্বিক নাট্যকৃতি সচেতন, অ্যাবসার্ডিষ্ট । বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬), 'ধর্মগোলা' (১৯৬৭), বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫), 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৭), উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) নাটকগুলোর পাশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু'-র মত নাটকগুলো সত্যিই ব্যতিক্রম । আর এখানেই তিনি অনন্য ।

নাটকের মত ছোটগল্প রচনাতেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী স্থান অধিকার করে আছেন । তবে বাংলা ছোটগল্পে তাঁর স্থান নির্ণয়ের পূর্বে আমরা এক ঝলক ফিরে তাকাব বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের দিকে ।

বাংলা ছোটগল্পের জনক ও প্রধান শিল্পী হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । কিন্তু তা হলেও তাঁর পূর্বসূরিদের মধ্যেও ছোটগাল্পিক প্রবণতা একটু একটু করে উন্মোচিত হচ্ছিল । এ বিষয়ে উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথেরই ন-দিদি স্বর্ণকুমারি দেবী এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা । স্বর্ণকুমারী দেবী ছোট ছোট গল্প বা নবকাহিনী নাম দিয়ে তাঁর গল্পগুলোর সংকলন বের করেছিলেন । নবকাহিনীর প্রথম গল্প 'ভীমসিং' প্রথমে বের হয়েছিল ভারতী ও বালক পত্রিকায় ১২৯৩ বৈশাখ সংখ্যায় । তিনি সচেতনভাবেই ছোট ছোট গল্প, অর্থাৎ ছোট আকারের গল্প লিখেছিলেন । তাঁর গল্পগুলোতে আগাগোড়াই স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত হয়েছে এবং এখানেই স্বর্ণকুমারী রচনার দেবীর স্বাতন্ত্র । সমাজ সেবামূলক গল্প হিসেবে তাঁর 'গহনা' এবং 'বিদ্রোহী'-দুটোই বেশ চিত্তাকর্ষক রচনা ।

অন্যদিকে মাত্র দুটি গল্প লিখেছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'উপন্যাস' নাম দিয়ে । এদের দুজনের লেখাতেই ছোটগল্পের পূর্বাভাস অনেকটাই ফুটে উঠেছে । পরবর্তীকালে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক এবং সফলতম বিকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে । তিনিই বাংলা ছোট গল্পের জন্মদাতা আবার তিনিই বাংলা ছোটগল্পের মুক্তিদাতা । তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যেও মণিমুক্তার মত মূল্যবান । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার সময়সীমা সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর । ফলে দীর্ঘসময়ব্যাপী রচিত তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পের শ্রেণি নির্ধারণ করা খুব একটা আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয় । বিভিন্ন সমালোচক তাঁর ছোটগল্পের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করাছেন । এ থেকে আমরা তাঁর ছোট গল্পের দুরূহতা এবং বৈচিত্র সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করতে পারি । সবদিক বিচার বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়--

১. হিতবাদী পর্ব (১৮৯১ খ্রি.)

২. সাধনা-ভারতী পর্ব (১৮৯১-১৯১৩ খ্রি.)

৩. সবুজপত্র পর্ব (১৯১৪-১৯২৯ খ্রি.)

৪. তিন সঙ্গী পর্ব (১৯৩৯-১৯৪০ খ্রি.)

হিতবাদী পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গল্প মাত্র ছটি । এগুলো হল-দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান এবং তারাপ্রসন্নর কীর্তি । যদিও এ গল্পগুলোর পূর্বে 'ভিখারিণী', 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা' নামক তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু এ পর্বে প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পটিকেই আকারে-প্রকারে

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক ছোটগল্পরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে । সাধনা-ভারতী পর্বে লিখিত গল্পগুলোর অধিকাংশই পদ্মা তীরবর্তী স্থানে বসে লেখা ।

ফলে গ্রাম বাংলার নৈকট্য, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের ছোট ছোট হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ এসবই এ পর্যায়ের ছোট গল্পগুলোতে পাওয়া যায় । এ পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হল-'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি', 'দুরাশা', ক্ষুধিত পাষাণ', 'নষ্টনীড়' ইত্যাদি । রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্র পর্ব মূলত আবর্তিত হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে । রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের গল্পের মূল সুর প্রধানত বংশ বনাম ব্যক্তির লড়াই । এই দ্বন্দ্বের এক চেহারা আমরা দেখি 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী' ও 'বোষ্টমী' গল্পত্রয়ীতে । সবুজপত্রের পর পর তিনটি সংখ্যায় এই তিনটি গল্প প্রকাশিত হয় । আসলে এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের বিদ্রোহ, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, নারীর আত্মমর্যাদা প্রভৃতি ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন । 'হালদারগোষ্ঠীতে' অনড় বংশমর্যাদাবোধ ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম, 'হৈমন্তী'-তে একান্নবর্তী পরিবারের রুদ্ধ দুর্গে খোলা হাওয়ার প্রবেশাধিকার আবার 'বোষ্টমীতে'-বংশ পরম্পরার বিরূদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ শিল্পরূপায়িত হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে এ সব গল্পে রয়েছে তত্ত্বের প্রাধান্য । এক্ষেত্রে আগে তত্ত্ব, পরে গল্প।

১৯৩৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত 'ল্যাবরেটরী', 'রবিবার' এবং 'শেষকথা' -এই তিনটি গল্পকে নিয়ে গঠিত তিনসঙ্গী পর্ব । মৃত্যুর সিংহদ্বারে উপনীত হয়ে সুগভীর মর্ত্যমমতা এবং নির্মম নিরাসক্তি -এ দুয়েরই স্বীকৃতি পাওয়া যায় এই তিন সঙ্গী পর্বে । রবীন্দ্র প্রতিভার যে অমোঘ চিহ্ন তিরিশের দশকে রবীন্দ্র ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়, তা তাঁর তিন সঙ্গী-র গল্পগুলোতেও দেখা যায় । মোটামুটিভাবে রবীন্দ্র ছোটগল্পের রচনাকাল ১৮৯১-১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত । আর এই দীর্ঘ সময়ে জনসমাজ ও সাহিত্য জগতে অনেক ভাঙ্গাগড়া, রীতির বিলয় বা উত্থান ঘটেছে ,মানব স্বভাবেরও ঘটেছে অনেক পরিবর্তন । উনবিংশ শতাব্দীর শান্ত পৃথিবী থেকে আমরা প্রবেশ করেছি বিশ্বযুদ্ধোত্তর এক নৈরাশ্য-নৈরাজ্য-বিদ্রোহের তপ্ত পরিবেশে। আর এ সব কিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্র ছোটগল্পে । ফলে তাঁর বিভিন্ন সময়ে রচিত গল্পগুলোতে কখনও বা দেখা দিয়েছে বিষয়গত পরিবর্তন আবার কখনও বা দেখা দিয়েছে আঙ্গিকগত পরিবর্তন । বাংলা ছোটগল্পের প্রাণভোমরা নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথেই । কিন্তু তা হলেও রবীন্দ্র প্রতিভা যখন আপন মহিমায় জাজ্বল্যমান তখনও বাংলা ছোটগল্পের অরাবীন্দ্রিক শাখাটি যে বন্ধ্যা ছিল, তা নয় । রবীন্দ্র সমসাময়িককালে অনেকে লেখকই নিজ

নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন । এক্ষেত্রে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন নগেন্দ্র গুপ্ত । তিনি অনেক ছোটগল্পের রচয়িতা । তবে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'নতুন বাড়ি' গল্পটি প্রেম, সামাজিক সমস্যা ও রহস্যময়তাকে কেন্দ্র করে সার্থকতায় উন্নীত হয়েছে । এঁর গল্প সংকলন গ্রন্থিত দুই খন্ডে-- নগেন্দ্ররচনাবলী (১৯২৫) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড । আর একটি গল্প সংকলনগ্রন্থের নাম রথযাত্রা ও অন্যান্য গল্প (১৯৩২) ।

একই সময়ের আর একজন ব্যক্তিত্ব হলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি । আমরা মূলত তাঁকে একজন কঠোর রবীন্দ্রসমালোচকরূপেই জানি । কিন্তু সমালোচনার পাশাপাশি তিনি অনেক ছোটগল্পও রচনা করেছিলেন যা আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছে । বর্তমান পাঠক ছোটোগল্পকার সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র সমালোচক সুরেশচন্দ্রকে মনে রেখেছেন । যাই হোক তাঁর পত্রের মাধ্যমে বর্ণিত 'প্রাইভেট টিউটর', ও 'কমলা'-দুটিই নতুন ধারায় প্রেমের গল্প ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । এছাড়া শৈলেশ মজুমদারের 'ইন্দু', এবং সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ি', 'রসভঙ্গ', 'অনুতাপ', 'জলাঞ্জলি', 'যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার' নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের 'সারদা', 'বন্যা' এবং হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'নীরা' প্রভৃতি গল্প সার্থকতায় মন্ডিত । রবীন্দ্রযুগের উজ্জ্বল পরিমন্ডলের আর-এক জ্যোতিষ্ক হচ্ছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগমনের পূর্বে পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম । জীবনের স্বল্প পরিসরে একমুখী ঘটনা অবলম্বনে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষম্য ও অসংগতি, ক্ষুদ্র আশা ও তার পরিণতি, ক্ষুদ্র সমস্যা প্রভৃতি কেন্দ্র করে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলির মান অনেক উন্নত ।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রভাতকুমারের রচনার মধ্যে খুবই প্রোজ্জ্বল । কিন্তু তা হলেও ছোটোগল্পশিল্পী প্রভাতকুমার আপন স্বাতন্ত্রে ভাস্বর । রবীন্দ্রভক্ত হয়েও তিনি আগাগোড়াই রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক । তাঁর 'দেবী' গল্পটি পড়লেই আমরা তা বুঝতে পারি । রবীন্দ্রনাথ ওই গল্প নিশ্চয়ই তেমনভাবে লিখতেন না । কবির সঙ্গে এই স্বভাব-গাল্পিকের পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে আপেক্ষিক লঘুতা ও সরলতা প্রবণতার কথা বলা হয়েছে । কিন্তু রসিকতাই প্রভাতকুমারের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করলে ভুল করা হবে । লঘুতার প্রশ্নই ওঠে না, গল্পলেখক হিসেবে প্রভাতকুমার যেখানে সর্বাপেক্ষা রসোত্তীর্ণ সেখানে তিনি রীতিমতো

সিরিয়াস । 'দেবী', 'আদরিণী', 'হিমানী', 'কাশীবাসিনী', 'মাতৃহীন' ইত্যাদি গল্প তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ।

রবীন্দ্রসমকালের আর একজন উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী । তিনি জন্ম দিয়েছিলেন স্কেচধর্মী অণুগল্পের । এছাড়া তাঁর ছোটগল্পগুলোর আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল- 'বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব' । বাংলা গল্পে সম্পূর্ণ নতুন প্লটের আমদানি করে তিনি সেকালে যে চমক সৃষ্টি করেছিলেন, তা তাঁর 'বাঘের নখ' গল্পটিতেই প্রকাশ পেয়েছিল । এদিক থেকে তিনি আধুনিক কালের কাছাকাছি । এঁরা ছাড়াও রবীন্দ্রসমকালে আরও যেসব লেখকদের কথা উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন-চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সরলাদেবী চৌধুরাণী, ইন্দিরাদেবী প্রমুখ ।

যে রবীন্দ্র গল্পের জন্ম হয়েছিল লিরিকধর্মিতার মধ্য দিয়ে সেই রবীন্দ্র ছোটগল্পেও শেষ পর্যন্ত জীবনের জটিলতা, মানুষের মনের কুটিলতা আশ্রয় নিয়েছিল । আধুনিক জীবনকে দেখার নব নব পদ্ধতি সেখানে দেখা দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জন্ম রোমান্টিক তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে রচিত তিন সঙ্গী পর্বের-'ল্যাবরেটরী', 'রবিবার', 'শেষকথা' গল্পত্রয়ীতে বর্ণিত জীবনের জটিলতা আমাদের বিস্মিত করে বৈকি । যদিও সেক্ষেত্রে তিনি আধুনিক জীবনের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিতেই ।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্র ছোটগল্পের পূর্ণগ্রাসের সময় যে সমস্ত রবীন্দ্রসমসাময়িক ছোটগল্পকার উঠে আসলেন তাঁদের অনেকেই আপাতদৃষ্টিতে বাঁধাগতের লেখক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে একই সঙ্গে যেমন রয়েছে পরম্পরাগত ঐতিহ্য, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে নূতনের ইঙ্গিত । এক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা । যিনি কিনা ছিলেন আদ্যন্ত রাবীন্দ্রিক হাওয়ায় লালিত । কিন্তু সেই তিনিই যখন কোন গল্প লেখেন তখন তা একই সঙ্গে হয়ে ওঠে রবীন্দ্রানুসারী ও রবীন্দ্রোত্তর গল্প । এক্ষেত্রে আমরা 'দেবী' গল্পটিই উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি । কারণ এই গল্পটির প্লট স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দান যা লেখক নিজেই আমাদের জানিয়েছেন । গল্পটির প্লট রবীন্দ্রনাথের দান হলেও এর স্রষ্টা কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই প্রভাতকুমার । গল্পের সর্বশেষ পরিস্থিতির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে উৎকণ্ঠার শেষতম নিশ্বাস উদ্গীর্ণ করে ট্র্যাজেডির মধ্যে গল্পটির অবসান ঘটেছে --

''পর দিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ । পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত গলায় পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছে''[১২]

এখানেই প্রভাত কুমার স্বতন্ত্র । এই যে ধীরে ধীরে গল্পের পরিবর্তনের সূচনা হল তা পরবর্তীকালে বিশাল আকার নেয় তিরিশ- চল্লিশ-এর দশকে । যার সূত্রপাত ঘটে কল্লোল গোষ্ঠীর হাত ধরে । সব দিক থেকেই সেই সময় শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই চলছিল টালমাটাল অবস্থা । সেদিনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল এরকম--

ক. রুশ বিপ্লব ।

খ. অসহযোগ আন্দোলন ।

গ. মানবেন্দ্র রায়ের সাম্যবাদী আন্দোলন ।

ঘ. কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ।

ঙ. মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ।

চ. আইন অমান্য আন্দোলন ।

ছ. বাংলায় মার্কস এর দর্শন ও লেলিন এর রনকৌশল চর্চা ।

জ. ফ্রয়েডের যুগান্তকারী মনোবিকলন তত্ত্বের ইংরেজি অনুবাদ প্রচার ।

ঝ. ইয়ুং এবং এলিস -এর প্রেমের দেহবাদী এবং যৌনবাদী ব্যাখ্যার প্রচার ।

ঞ. জর্জ বার্নাড শ এবং ফেবিয়ানদের নব অর্থনৈতিক চিন্তার প্রচার ।

ট. সর্বোপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ।

এত কিছু ঘটে গিয়েছিল খুব অল্পসময়ের মধ্যে । আর স্বাভাবিকভাবেই বাহ্যিক জগতের এই ওলোট-পালটে চিন্তাজগতেও বিপ্লব আসতে বাধ্য হয়েছিল । ফলে সেদিনের বুদ্ধিজীবীরা স্বয়ং উত্তেজিত ও আলোড়িত হয়েছিলেন। যেমন কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), উত্তরা, ধূপছায়া প্রভৃতি কতগুলো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক রবীন্দ্রোত্তর যুগ প্রবর্তনের সংকল্প করেছিলেন । এদের মধ্যে পুরোধা পত্রিকা কল্লোলের নাম অনুসারে এই লেখকবৃন্দ মূলত কল্লোল-গোষ্ঠী নামে পরিচিত হন।

এই গোষ্ঠীর লেখকরা মূলত রবীন্দ্রবিরোধিতার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল নতুন যুগের অবিশ্বাস ও অস্থিরতা । আসলে কল্লোল-কেন্দ্রিক সাহিত্য ছিল একটা বিদ্রোহের সাহিত্য । এই বিদ্রোহ ছিল দুদিক থেকে--

ক. রবীন্দ্রনাথের প্রতি ।

খ. রোমান্টিকতার প্রতি ।

তাঁদের দু'একটা ভাবনার কথা তুলে ধরলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে । যেমন--

ক. ''যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ ।''[১৩]

খ. ''মানুষের মানে চাই
গোটা মানুষের মানে
রক্তমাংস হাড় মেদ মজ্জা
ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত-
গোটা মানুষের মানে চাই ।''[১৪]

মোট কথা তখন সমস্ত দিক থেকেই একটা নাড়া দেবার প্রবণতা ছিল । কল্লোল-গোষ্ঠীর অনেক লেখকই বিদ্রোহী ছিলেন, তবে তার মধ্যে প্রধান কান্ডারী ছিলেন তিনজন । এঁরা হচ্ছেন--

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ।

বুদ্ধদেব বসু ।

এছাড়া এঁদের সঙ্গেই ছিলেন মণীশ ঘটক, যিনি 'যুবনাশ্ব' নামেই অধিক পরিচিত । যাই হোক, ছোটগল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের আগমনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন যিনি, তাঁর নামটিও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য । তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব । তাঁর প্রথম গল্প 'কয়লাকুঠী' প্রকাশিত হয় মাসিক বসুমতী-তে (১৯১২ খ্রি. কার্তিক, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) এবং সে বছরই ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসী-তে । এই গল্প প্রকৃতপক্ষে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল । কয়লাখনির সাঁওতাল নরনারীর জীবনের রূপায়ণ এটি । তবে শৈলজানন্দ কেবল বীরভূম, বর্ধমান জেলার গ্রামীণ সমাজ আর কয়লাকুঠীর প্রেক্ষাপটেই গল্প লেখেননি শহর কলকাতার প্রেক্ষাপটেও লিখেছেন । যেমন 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা' (প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ১৯২৪ খ্রি.) গল্পটি তার নিদর্শন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতার দুঃখ, দারিদ্র, হতাশার এক সার্থক শিল্পিত রূপ এটি।

অন্যদিকে কল্লোল-গোষ্ঠীর যে প্রধান তিন কর্ণধার-প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, এদের মধ্যে মিল ঠিক যতটা অমিলও ঠিক ততটাই । বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমারের রচনায় যে কাব্যময়তা পাওয়া যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা তা থেকে আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত । আবার বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যতটা নাগরিক জীবনের লেখক অচিন্ত্যকুমার ঠিক ততটা নন । তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন গ্রাম্য জীবনকে, গ্রাম বাংলার মানুষকে । আর সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর ছোটগল্পের ছত্রে ছত্রে । প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার, উভয়েই নিম্ন মধ্যবিত্তের দারিদ্র ও পরাজয়কে বিষয় করে গল্প লেখা শুরু করেছিলেন । প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী' ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'দুইবার রাজা' গল্প দুটি তারই প্রমাণ । অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসু শুরু করেছিলেন আদিম যুগের পিপাসা নিয়ে । যার প্রমাণ 'রজনী হল উতলা' (জৈষ্ঠ্য ১৩৩৩, কল্লোল) । একদিকে বুদ্ধদেব বসু সংকীর্ণ জীবনের রূপকার, অন্য দিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমারের গল্পের পটভূমি ব্যাপক ও বিচিত্র । বুদ্ধদেব বসু সমাজ জীবনের চিত্রকর নন । তাঁর গল্পে সমাজ গৌণ । আবার প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্য কুমারের গল্পে সমাজ মুখ্য । এঁরা দুজনেই পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে গল্পের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন । যেমন ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রবোধকুমার স্যান্যাল । আর বুদ্ধদেব বসু গল্পকে পেয়েছেন বিদগ্ধ তরুণের মনোলোকে । বস্তুত বুদ্ধদেবের গল্পে আত্মজৈবনিক উপাদানের প্রাচুর্য আছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজেই তাঁর গল্পের নায়ক, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্য কুমার সম্পর্কে যা বলা যায় না ।

এত গেল আমাদের তরুণ সমাজের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও দার্শনিক মননভূমিতে বাইরের ঘটনা ও আইডিয়ার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা । এছাড়াও বিদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানস সান্নিধ্যও তাঁরা কমবেশি পরিমাণে লাভ করেছিলেন ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণত বিদেশি সাহিত্য বলতে আমরা বুঝতাম শুধুমাত্র ইংরেজি সাহিত্যকে । ফরাসি সাহিত্যও তার সঙ্গে কিছুটা যুক্ত ছিল । সেই সময় মানসিক ক্ষেত্রে জার্মান দার্শনিকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকলেও সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে জার্মানদের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় ছিল না । পরাধীন দেশের পরাধীন দায় হিসেবে যেন তখনকার বাঙালী শুধুমাত্র অ্যাংলো-স্যাক্সেন সৃষ্টিমন্ডলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন । তাঁদের প্রাণ-মনের আকুতিও তাকেই স্বীকার করে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল । কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন ইউরোপের অবারিত দ্বার খুলে দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল তখন আমাদের সাহিত্যিক ক্ষুধা

আরও বেড়ে গেল । ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের বাইরেও যে ইউরোপীয় সাহিত্যের এক মহান ভান্ডার মজুদ আছে এ সংবাদে বাঙালি পাঠক ও বোদ্ধাদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল । আর ঠিক সেই সময়ে ফরাসি, ইতালিয়ান, জার্মান, পোলিশ, রাশিয়ান, জাপানি, স্ক্যান্ডানেভিয়ান, নরওয়েজিয়ান ও স্প্যানিশ সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ বাংলার বই বাজারে সুলভ হয়ে উঠল। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি এতদিনের অনুরাগ তো ছিলই, তার সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হল কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রভাব । একথা স্মরণ করেই কল্লোলের কালে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন-

''ফরাসী রুশ নরোয়েজীয় উপন্যাসগুলোর ইংরেজী তর্জমা যদি বাংলাদেশে না ছড়াতো তবে একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধ্য ছিল না । দেশের তরুণ-তরুণীদের এমন universel প্রেমের মন্ত্রণা দেন ।''[১৫]

ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও 'টাইমস্ লিটারেট সাপ্লিমেন্ট'-এ প্রকাশিত কন্টিনেন্টাল সাহিত্যেরও বিবরণ তাঁরা সাগ্রহে পড়তেন । তখনকার দিনের বিদেশি সাহিত্যের বাংলা সংবাদের অনেকটাই যে ওই সাপ্লিমেন্ট নির্ভর ছিল তা তুলনামূলক বিচারসাহিত্যিকদের মৌখিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায় । আরও জানা যায় তাঁরা অনেক জীবিত সাহিত্যিকদের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ করতেন । মূলত এসবের সমষ্টিগত ফলই বাংলার তরুণদের মনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কল্লোলীয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ ভাষিকতা স্মরণযোগ্য--

''বাংলাদেশে এক দল তরুণ সাহিত্যিক উঠছেন.....তাঁদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আছে যে তাঁরা সাহিত্যের আদর্শের জন্য নাকি সাগরের দিকে চেয়ে থাকেন । নূতন নূতন বিলাতী ও য়ুরোপীয় নামের মোহ এই তরুণ দলকে ঘিরে আছে.....যদি য়ুরোপের সাহিত্য তরুণ বাঙালীকে টেনে থাকে তবে তার প্রয়োজন আছে । সাহিত্যের সপ্তসিন্ধুর জল আজ মঙ্গলঘটে ভরা চাই নইলে অভিষেক হবে কি করে ? য়ুরোপের সাহিত্য আজ একটা কথা তরুণ বাঙালীর কানে খুব করে বলে দিচ্ছে যে, মানুষের দাম অনেক বেড়ে গেছে । তোমরা সেকথা ভুলে গিয়েছ । বাঙালীর ছেলে অবাক হয়নি তবে, অনুতপ্ত হয়েছে।''[১৬]

আর এই বিদেশি সাহিত্যসমুহের মধ্যে রুশ সাহিত্য প্রীতির কথাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের এই বিশেষ দিগন্তে আমাদের তরুণকুলের সস্নেহ দৃষ্টিপাত

বিশ্বমানবতাধর্মী প্রত্যয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি ভালো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী ও কল্লোলের পাতায় ।যথা--

১. 'বর্তমান রুশ সাহিত্য'-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৩২)

২. রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী-বুদ্ধদেব বসু (কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৩)

তরুণ বাঙালির মন য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে যুদ্ধোত্তরকালে পেয়েছিল মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, বাস্তব ও জনগণতান্ত্রিক চেতনা, মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচারজাত নতূন মূল্যবোধ দুঃখাত্মকতা ও বিষাদচেতনা, আর সেইসব নতুন মত ও পথ তাঁদের দেহে ও মনে ছিল সরস স্বাস্থ্যের অভাব । সুতরাং সংগত কারণেই এর অনিবার্য প্রভাব পরেছিল কল্লোল-এর সাহিত্যে ।

সুতরাং আমাদের একথা স্বীকার করতে হবে যে কল্লোল এ যে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার সুর আমরা শুনতে পেয়েছিলাম, তার পেছনে সামাজিক ও জৈবিক প্যাটার্নের নানা সূত্র কাজ করেছিল । অবশ্য তরুণ লেখকদের কল্পনা প্রবণ চিত্তবৃত্তির কাছে সাহিত্যিক নিহিতার্থ হিসেবে রোমান্টিক মেলাংকলির আকর্ষণও ছিল প্রচুর । পাশ্চাত্য সাহিত্যে তার অনেক দৃষ্টান্ত তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন । তাঁরা মনে করতেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাব বীজটির নতুন ফসল ফলিয়ে তোলার অনেক সম্ভবনা আছে । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবৃত্তে দুঃখের বিচিত্র ঢেউ উঠেছে বটে কিন্তু পরিণামে দেখা গেছে তিনি পৌঁছে গেছেন সেইখানে যেখানে এসে বলতে পারা যায়--

'তবুও আশা জেগে থাকে প্রাণের বন্ধনে ।'

কিন্তু কল্লোলীয়রা বয়সোচিত জীবনতৃষ্ণা নিয়েও জলের মত ঘুরে ঘুরে কেবল দুঃখের কথাই কইলেন, কারণ তার মধ্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রেতর সুর, নতুন প্রাণের বাণীসংগীত । যে বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের বন্ধন কেটে উড়তে চেয়েছিলেন তা সর্বাংশে সার্থক না হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁরা যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই । আর এই ধারাই প্রতিক্রিয়ারূপে যে দুজন লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলা গল্পের প্রাঙ্গনে এই দুজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন বলেছেন--

''তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠীর সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শণ করেছিলেন । তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ পুর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন-পুরনো গ্রামের জমিদার ঘর হইতে নদীর চরের মাল-বেদে পাড়া পর্যন্ত ।''[১৮]

আসলে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তারাশঙ্কর যে শৈলজানন্দের প্রদর্শিত পথেরই অনুসারি তা স্বয়ং তারাশঙ্করও স্বীকার করেছেন। উভয়ের রচনা ভঙ্গিতেই প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে । যেমন--

১. দুজনের রচনাতেই প্রচলিত জীবনগন্ডি বহির্ভূত বিষয়বস্তু বিচার ও বৈচিত্র বর্তমান ।

২. শৈলজানন্দের মতই কয়লাখনির প্রেক্ষিতে একাধিক অবিস্মরণীয় ছোটগল্প লিখে গিয়েছেন তারাশঙ্কর । তাঁর 'ঘাসের ফুল', 'ছলনাময়ী' ইত্যাদি গল্প এর উদাহরণ ।

৩. তারাশঙ্করের প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় কল্লোল পত্রিকায় ।আর এই কল্লোল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই শৈলজানন্দ ছিলেন প্রায় অবিরত লেখক ।

তবে কল্লোলে আত্মপ্রকাশ করেও এবং শৈলজানন্দের স্বভাবের ধারা অনুসরণ করেও তারাশঙ্কর নিজ শক্তিতে তাঁদের অতিক্রম করে অন্য এক ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ নিজের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিয়ত সচেতন, আবার কখনো হয়তো বা অতি সচেতন । এ প্রসঙ্গে আমরা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি--

''জীবনের প্রতি আগ্রহ তাঁর সবল, সমাজ বোধ তাঁর আছে, সমাজের পতন উত্থানের কারণ খানিকটা তিনি ধরতে পেরেছেন ।''[১৯]

তাই কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজ শিল্প প্রকৃতির স্বভাব স্বাতন্ত্র তারাশঙ্করের কণ্ঠেই ঐতিহাসিক স্পষ্টতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে । আসলে কল্লোলের নাগরিক মনোভাবের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না ।

কল্লোল এর পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ, সমরোত্তর পশ্চিমি দুনিয়ার যৌবনোল্লাস ও যৌনমুক্তি, বিদ্রোহ ও নেতিবাচক জীবনদৃষ্টি, যা ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্য থেকে কল্লোলীয় লেখকেরা সংগ্রহ করেছিলেন তার সঙ্গে তারাশঙ্করের কোন যোগ ছিল না । তাঁর জীবনবোধ ও রসসাধনার মূলে ছিল দেশজ সংস্কৃতি । আর এ কারণেই তিনি কল্লোল-উত্তর ।

তারাশঙ্করের সমসাময়িক আর একজন জনপ্রিয় ছোটগল্পকার হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালের দিক থেকে তাঁর ব্যক্তিক বিকাশ এবং শৈল্পিক অভুদ্যয় কল্লোলের ইতিহাসের সমান্তরালবর্তী । বস্তুত সেই তরঙ্গ ক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক আলোড়নের লগ্নে । কিন্তু তা হলেও ব্যক্তিগত দৈহিক অবস্থানে সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও শিল্পী বিভূতিভূষণ ছিলেন সমস্ত কিছুর অতীত । এখানেই বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে কল্লোলোত্তর কালের তরঙ্গলীন তটরেখার আভাস লক্ষ্য করা যায় । তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সালের প্রবাসী, মাঘ সংখ্যায় এবং এই প্রথম গল্পের মধ্যেই তাঁর শিল্পধর্মে দ্বিধাহীন স্বাক্ষর পাওয়া যায় । গল্পটিতে প্রকৃতির পটভূমিতে নারী প্রেম তথা অলৌকিক নারী স্নেহের অবাস্তব মনোহর রূপ উদ্‌ঘাটন আর সমস্ত কিছুর মর্মে সিঞ্চিত শিল্পীর রোমান্স স্বপ্নের মদিরা প্রবাহ ঘটেছে । প্রকৃতি প্রেম এবং সারল্য-এ দুই ছিল তাঁর গল্প সাহিত্যের অসাধারণ শৈলী । কি প্রকরণে, কি বিষয় বিন্যাসে, সব দিক থেকে তাঁর রচনা অপ্রত্যাশিতভাবে সরল, যার ফলে সৃষ্টির মধ্যে জীবনের ভারটুকু আর কিছুই অনুভব করা যায় না । দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর অতি প্রাকৃত বিষয়ক গল্পগুচ্ছের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি । বিশেষ করে 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' এবং 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প'- দুটিতে অতি লৌকিক অস্তিত্বের সান্নিধ্য জনিত বীভৎসতা এবং মাদকতার উপকরণ পরিবেশিত হয়েছে যথেষ্ঠ পরিমাণে । মোটকথা 'কল্লোলের কাল'-এর আঙ্গিক সচেতন জীবন জটিলতায় ভারাক্রান্ত আত্মখন্ডিত জীবনের পথে বিভূতিভূষণ ছিলেন স্বপ্নলোকে নিবদ্ধ দৃষ্টি এক আনমনা পথিক-স্বপ্নলোকের ভারহীন স্বাদ আর অধরা সুরভিতে সমগ্র চেতনাকে প্রত্যয় স্নিগ্ধ খুশিতে ভরে বিদায় নিয়েছেন -বিশ শতকীয় জীবনের পঙ্কসরোবরে যিনি মানস সরোবরের শিল্প দূত ।

কল্লোলের স্বপ্নাতুর রোমান্টিক জীবনদৃষ্টি, সম্ভোগ উল্লাস, যৌবন মুক্তির আমন্ত্রণ, দারিদ্রের আস্ফালন, যৌবনের সহজ স্ফূর্তি যে আধুনিকতাকে আনতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। তা এসেছিল তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, সমকালীন গল্পকার জগদীশ গুপ্তের হাত ধরে । এই ধারাতেই এসেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তীকালে সুবোধ ঘোষ । এঁরা কেউই কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক নন । কিন্তু তিনজনেই প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা রহস্যময়তা, স্ববিরোধিতা, তাকে জানতে চেয়েছিলেন । গল্পকার হিসেবে তাঁরা ছিলেন চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতশূন্য, আবেগ বিষয়ে নির্বিকার, শিল্পী হিসেবে নিরাসক্ত, পরিবেশ সচেতন এবং বিজ্ঞানমনস্ক। তিন জনেই তাৎক্ষণিক থেকে চিরায়ত সমস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষের অন্তরালে

জটিলতার আবিষ্কারে ও তার রূপ সন্ধানে ছিলেন ব্যগ্র । তবুও সর্বক্ষেত্রে মিল এদের মধ্যে নেই। মিল শুধুমাত্র এইখানেই যে, তিনজনেই হৃদয়াবেগ ও শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে মূলধন করে গল্প লেখেন নি । এরা সকলেই কুচক্রী অন্ধ নিয়তির লীলা ও শয়তানি সম্পর্কে অবহিত ।

জগদীশ গুপ্ত যেমন তিক্ত, নৈরাশ্যবাদী জীবনকে আগাগোড়া নির্মম দৃষ্টিতে দেখেছেন, মানিক ও সুবোধ ঘোষ তা দেখেননি । শেষোক্ত দুজনের ছোটগল্পের যে সামাজিক বিশ্লেষণ ও তার ক্রমবিবর্তন দেখা যায়, জগদীশ গুপ্তের লেখায় তা অনুপস্থিত । তিনি রিয়ালিজমের শিল্পী নন, ন্যাচারিলিজমের শিল্পী । অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষকে তা বলা যাবে না । আবার এঁদের মধ্যেও পুরোপুরি মিল নেই । বস্তুতপক্ষে এক লেখকের সঙ্গে অপর লেখকের সব দিক দিয়ে মিল প্রত্যাশা করাটাই অনুচিত । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনাশৈলীতে যতটা তিক্ত সুবোধ ঘোষ ততটা নন । দুজনেই কিন্তু আবার গল্প সৃষ্টিতে চরিত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে সচেতন । অপরপক্ষে ব্যক্তি মানুষের বাধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে প্রয়াস মানিক ও সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে অভ্যর্থিত কিন্তু জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে তা সম্মানিত হয় নি ।

তবে তিনজনেই মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত । তাঁরা জানেন যে, জীবনের অভিজ্ঞতা সামাজিক পরিবেশ, অর্থনীতির চাপ ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় । তার ফলে তাঁদের সেই চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁদেরই ছোটগল্পগুলোতে ।

বাংলা ছোটগল্পের যে ধারায় রবীন্দ্র যুগ, কল্লোল যুগ এবং কল্লোল উত্তর যুগের কথা আলোচনা করলাম আমরা এবার সেই ধারা অতিক্রম করে সমরকালীন যুগে প্রবেশ করব । এর সময়সীমা মোটামুটি ১৯৩৯-১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত । সেই সময় যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছিলো সেগুলো হল-

১. জাপানি আক্রমণ (১৯৪০)

২. অগাস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা (১৮৪২)

৩. পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩)

৪. দক্ষিণ পূর্ব এশিয় রণাঙ্গনে সমরায়োজনের মঞ্চরূপে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার করা (১৯৪১-১৯৪৫)

৫. হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯৪৭)

৬. আজাদ হিন্দ আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৪৭)

৭. দেশবিভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও উদ্‌বাস্তু আগমন (১৯৪৭-১৯৫৩)

এই সকল ঘটনাই একের পর এক ঘটে গিয়েছিল । মন্বন্তর, বিমান আক্রমণ, কন্ট্রোল, রেশনিং, মিলিটারি সাপ্লাই, যুদ্ধকালীন কলকাতার সমাজজীবনের অধোগতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক মূল্যবোধের বিনাশ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু স্রোত প্রভৃতি ঘটনা দেশের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল । এই সময় ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলা ছোটগল্পের আর এক মাইলস্টোন, যা চলেছিলো পাক্কা ছটি বছর । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । বিধ্বংসী সুনামির মত এই বিশ্বযুদ্ধ দেশের ভেতরে ও বাইরের জীবন স্বভাবের নানা রকম পরিবর্তন ঘটায় । যে সমস্ত বৃটিশ বিরোধী গণআন্দোলন বারবার নানাভাবে আশা-নিরাশায় ওঠানামা করছিল সেগুলি চরমরূপ লাভ করে বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলনের সময় । সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতায়, দেশীয় রাজনীতির ক্রস কারেন্টে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়াল মন্বন্তর, বিদেশি শাসন ও শোষক শ্রেণির চরম অবিমৃষ্যকারী শাসন ব্যবস্থা, কলকাতার বুকে বাংলাদেশের সীমান্তে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের পদসঞ্চারণার ঘটনা, বেকারত্ব, দারিদ্র, মধ্যবিত্ত মানুষ ও সংসারের অবক্ষয়, পচন, পতন, মেয়েদের চাকরি করতে বেরিয়ে আসার সুযোগে গণিকাবৃত্তির রকমফেরের আবির্ভাব, সর্বপ্রথম মজুতদার কালোবাজারি মুনাফাখোরদের সৃষ্টি-এসব নিয়ে পশ্চিম বাংলার জীবনে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । এরই মধ্যে বাধে ছেচল্লিশের দাঙ্গা । একসময়ে কাঙ্খিত স্বাধীনতা আসলেও তা অনুঘটকের মতো নিয়ে আসে দাঙ্গা, দেশবিভাগের লজ্জা ও জ্বালা, অসহায় বাস্তুহারাদের দল, অসম্ভব অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংকট ও সংঘর্ষ । প্রকৃতপক্ষে সেই অগ্নিগর্ভ, উত্তপ্ত সময়কে উপেক্ষা করা কোন লেখক বা সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না । তফাতের মধ্যে কেউ ছিলেন অধিক সচেতন আবার কেউ-বা ছিলেন অল্প সচেতন । এভাবেই সময়, সমাজ এবং সমকাল-মিলেমিশে বাংলা ছোটগল্পে তথা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে । বাংলা সাহিত্যে যেমন এক নতুন যুগের সূচনা হয় তেমনি অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বাংলা সাহিত্যও দ'ুভাগে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলতে থাকে । একটি শাখা ইতিমধ্যে তার শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হয়েছে আর অপর শাখাটি সবে মাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শুরু করেছে ।

পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে হয়ত এমন ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া যাবে না । যাই হোক এই বিভাগ কেন হল বা আদৌ হওয়া উচিত হয়েছে কিনা সে তর্কে না গিয়ে আমরা শুধু বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করব । ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর বৃহত্তর বঙ্গ সমাজ এবং সাহিত্যও সুস্পষ্টভাবে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় । যার একটি ধারা থেকে যায় পশ্চিমবঙ্গে এবং অপরটি চলে যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে । বাংলা সাহিত্যের এরকমই একটি যুগসন্ধির সময়ে আবির্ভাব ঘটে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র । যার জন্মভূমি পূর্ব বাংলা হলেও কর্মভূমি ছিল পশ্চিম বাংলা । এছাড়া তাঁর শিক্ষা গ্রহণেরও অনেকটাই এ বঙ্গেই হয়েছিল । তাই তাঁকে অনায়াসে এপার বাংলা বা ওপার বাংলা দুটো সাহিত্যের ইতিহাসেই গ্রহণ করা যায় । বাংলা ছোটগল্পে তাঁর আবির্ভাবের সময় কলকাতায় তখন ছোটগল্পের পালাবদলের এক রীতি শুরু হয়েছিল যাতে পরবর্তীকালে এক নতুন পালক সংযোজন করেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ । যাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে এতটা দীর্ঘ এক ভূমিকা সংযোজন করতে হল । পশ্চিম বাংলায় ছোট গল্পের ইতিহাস সম্পর্কে তো আলোচনা হল এবার আমরা একটু দেখে নেব সেই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ছোটগল্প ঠিক কোন অবস্থানে ছিল ।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে ঊনিশ শতকে যে নবজাগরণ ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে তৎকালীন মুসলমান সমাজ একাত্ম হতে পারে নি । কারণ তারা নব্য ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদেরকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে রেখেছিল । ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দানকেও পরম আগ্রহে গ্রহণ করে নি । পরবর্তীতে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা নব্য শিক্ষার জন্য আগ্রহী হতে শুরু করে । বিংশ শতাব্দীতে এই প্রচেষ্টার গতি কিছুটা বৃদ্ধি পায় । কারণ তখনও প্রত্যাশিত ব্যাপকতার কাছাকাছি মুসলমান সমাজের অগ্রগতি পৌঁছায় নি । কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের ফলে এই বিলম্বিত নবজাগরণ বেশ দ্রুত হয়ে ওঠে । নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজ নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । শিক্ষার যথেষ্ঠ প্রসার হয় । ঊনবিংশ শতাব্দীর যে নবজাগরণ বাঙালি হিন্দু সমাজে দেখা গিয়েছিল, বিশেষভাবে কলকাতা ও অন্যান্য বড় শহরকে কেন্দ্র করে, তার সঙ্গেই এই বাংলাদেশী নবজাগরণের উল্লাস ও ব্যাপকতার তুলনা করা চলে । ধর্মকেন্দ্রিক জীবনবোধ থেকে মুক্তির চেষ্টায় এক নব্য মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের আবির্ভাব ঘটে । উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা বিভাগ-পূর্বকালে কিছুটা সংকুচিত ছিলেন । কাজী নজরুল ইসলাম স্বয়ং এবং নজরুল ইসলাম প্রভাবিত

মুষ্ঠিমেয় কিছু লেখক যে সংকোচ দূর করতে পারেন নি । সর্বদাই হিন্দু লেখকদের শতবর্ষের অভিজ্ঞতা এবং হিন্দু পাঠকের সংখ্যা গরিষ্ঠতা তাঁদের মনে এক অসম প্রতিযোগিতার ভাব এনেছে। পূর্ব-পাকিস্তান তৈরি হবার পর তাঁদের সে সংকোচ অনেক কমে গেল । স্বাভাবিকভাবেই নাটক বা কাব্যের তুলনায় উপন্যাস বা ছোটগল্পে পরিবার-জীবন এবং সমাজের অনেক বেশি প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে ওঠে । সেই চিত্র এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী ব্যাপকভাবে এই সময়ের কথাসাহিত্যে স্থান পেতে থাকে । কেউ কেউ আবার ইসলামি আদর্শ শেখাবার চেষ্টা করল । কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্নতার বিরূদ্ধে অনেক কথাসাহিত্যিকই সরব হয়ে উঠলেন । বাংলা কথাসাহিত্যের স্বাভাবিক ঐতিহ্যে এক নতুন ধারা সংযোজিত হল । অবশ্য শুধু সমাজ ও পরিবারজীবনের চিত্রণের জন্যই নয় বৃহত্তর সমস্যার অন্তরে প্রবেশের জন্যে, মানব চরিত্র ও ভাগ্যের নানা দিক উন্মোচনের জন্য, রচনারীতির চিক্কন পারিপাট্যের জন্য বাংলাদেশের কথাসাহিত্য বেশ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল । পূর্ব-পাকিস্তান আমলেই বাঙালির মুক্ত মানসিকতার বাহন হয়ে উঠেছিল কথাসাহিত্য। বহু লেখকের মধ্যে বেশ কয়েকজন লেখক স্থায়িত্বলাভের শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে যাদের নাম উল্লেখ করতেই তাঁরা হলেন-মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান, আব্দুল ওদুদ ,কাজী ইমদাদুল হক, আবুল ফজল, হুমায়ূন কবির, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, শওকত ওসমান, আব্দুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ । আব্দুল মনসুর আহমেদ ব্যঙ্গাত্মক কাহিনি রচনায় অধিক নিপুণ । আর তাঁর কাহিনিগুলোর মধ্যে সামাজিক কুপ্রথাগুলি যেমন তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে তেমনি ব্যক্তিস্বভাবের স্খলন ইত্যাদি নিয়েও তিনি উজ্জ্বল ও উপভোগ্য রচনা উপহার দিয়েছেন । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল -'আয়না', আসমানি পর্দা','গালিভারের সফরনামা' ।

আবার ছোটগল্পকার হিসেবে আবুল ফজলও বেশ কৃতিত্বের অধিকারী । বিশেষ করে প্রেমচিত্র রচনায় তিনি সফল । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-'মাটির পৃথিবী', 'মৃতের আত্মহত্যা', 'চৌচির' । অপরদিকে শওকত ওসমান বেশ বড় মাপের কাহিনিকার । ছোটগল্পকে তিনি খুবই ছোট করে একটা আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠা তিনি ঘটিয়েছেন । তাঁর প্রয়াস বহুমুখী । অত্যন্ত আকর্ষণীয় তাঁর রচনারীতির বৈচিত্র্য । সামাজিক এবং ব্যক্তিকতা-এই দুই তারে তিনি সমানভাবে ঘা দিয়েছেন । তিনি জাতীয়তাবাদী, সমাজসচেতন, বামপন্থায় বিশ্বাসী । ফলে তাঁর সেই বিশ্বাসের ছবি ধরা পড়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে । পাক জমানায় তিনি এক প্রতিবাদী, সংগ্রামী লেখক। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের কাহিনিগুলোতে দরিদ্র মানুষের শোষণ, তাদের মুক্তির সংগ্রাম

যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি আঙ্গিকের সচেতন রূপায়নে, পাত্র-পাত্রীর স্বাভাবিক চরিত্র-মূর্তিতে প্রচারের প্রত্যক্ষতা সর্বদাই প্রায় আবৃত । সাধারণত বামপন্থী শিল্পীরা প্রায়ই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এড়িয়ে চলেন বলে লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একরঙা হয়ে থাকে । কিন্তু শওকত ওসমান মানব চিত্তের গভীরে প্রবেশ করেছেন, তাকে শ্রেণির চৌখুপিতে বেঁধে ফেলেননি । তিনি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকারদের মধ্যে একজন । তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো হল-- 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প', 'সাবেক কাহিনী', 'ওটেন সাহেবের বাংলো' ইত্যাদি । সাহিত্যের এ ধারায় এক নবতম সংযোজন হল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সমসাময়িক এবং আধুনিক শিক্ষায় প্রাণিত । চাইলেই তিনি কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের মতো কোন আধুনিক বিষয়কে তাঁর সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি । তিনি তাঁর সাহিত্যের বিষয় এবং পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজ এবং সেই সমাজে বসবাসকারী হতদরিদ্র, অশিক্ষিত মুসলিম জনসমাজকে । তিনি মনে করতেন সমাজ এবং জীবনের প্রতি তাঁর নিজের একটা দায় আছে । সেই দ্বায়িত্ব থেকেই তিনি তাঁর লেখাকে সমাজের কোন কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তাই বলেছেন--

''পশ্চিম জগত আজ যতটা এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরী। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়ত এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমি আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্যে যারা পিছিয়ে আছে । তাতে আমার ক্ষোভ নেই, এতে বড় রকম একটা sacrifice হবে অনেকে বলতে পারেন কিন্তু তাতে আনন্দ নেই, আছে সেই জ্ঞান যে আমি মানুষ হিসেবে উৎরে গেলাম, ওরাও যুগোপযোগী সাহিত্য পেলো, যে - সাহিত্যে কিছুটা হয়তো ভবিষ্যতের সোনা ছড়িয়ে থাকলো ।''[২০]

প্রচলিত ধর্মাচরণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের কোন আস্থা ছিল না । ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজে কোন মুসলিম ধর্মীয় আচার-আচরণ মেনে চলতেন না । কিন্তু তাই বলে তাদের জীবনচর্যার একান্ত নিজস্ব চরিত্রকে তিনি অস্বীকারও করেননি । ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি সমকালে সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তারকারি হিন্দু সমাজকে নিয়ে না লিখে মুসলিম সমাজকে নিয়ে লিখেছেন। কারণ হিন্দু সমাজ, হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে লেখার জন্য অনেকেই ছিলেন কিন্তু মুসলিম সমাজকে নিয়ে লেখার জন্য কেউ ছিল না । মুসলিম সমাজকে নিয়ে লেখার পাশাপাশি সেই লেখার প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটি ধারণাও তিনি নিজের মতো করে তৈরি করে

ছিলেন । সমাজকে বাদ দিয়ে যে কোন সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এ গুরুত্বপূর্ণ কথাটি তিনি মানতেন । তাই কাজি আফসার উদ্দিনকে লেখা এক পত্রে জানান--

''আমরা মুসলমান । হয়তো-বা মাত্র কয়েকঘর আমরা শহরে বাস করি এবং আমাদের বাড়ি শহরে । তা ছাড়া যে বিরাট সমাজ সভ্যতার জঞ্জাল, সে- সমাজের পক্ষে অতি আধুনিকতম সাহিত্যের তেমন প্রয়োজন আছে কি ? এবং সে- সাহিত্য যদি ব্যর্থ হয় তবে সে ব্যর্থতা হবে সেই রকম - ভারতীয় শিল্পকলা ছেড়ে [কোন] কিছুরও মধ্যস্ততা না নিয়ে এক লাফে সুরিয়লিজম শুরু করার যে - ব্যর্থতা । আমার তো তাই মত, তবে সেই মত খণ্ডন করতে রাজি আছি যদি শক্তিপূর্ণ যুক্তি পাই এর বিরূদ্ধে ।''[২১]

লেখকের এ বক্তব্যই স্পষ্ট করে দেয় তিনি কোন সমাজকে নিয়ে লিখবেন । মুসলমান মধ্যবিত্তসমাজ-নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত-সব ধরনের চরিত্রই তাঁর গল্পে আছে । তাঁর 'পাগড়ী', 'মৃত্যু', 'সতীন', 'খন্ড চাঁদের বক্রতায়', 'বংশের জের', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'চৈত্রদিনের দ্বিপ্রহরে', 'নকল', 'স্বপ্নের অধ্যায়'-এ ধরণের গল্প । তবে তিনি মুসলিম সমাজ জীবনকে নিয়ে লিখেছেন বলেই এই নয় যে তিনি শুধুমাত্র সেই সমাজকে নিয়ে ভালো ভালো কথা লিখেছেন । বরং তিনি এই সমাজের ভলো-মন্দ সমস্ত দিকই তুলে ধরেছেন । একদিকে তিনি যেমন পূর্ব বাংলার সহজ-সরল গ্রাম জীবনকে তুলে ধরেছেন তেমনি আবার অন্যদিকে সেই সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার, ভন্ডামি, মৌলবাদীদের শোষণ, নারীদের প্রতি অবহেলার চিত্র, তাদের বঞ্চনার কথা, সমাজের পুরুষদের বহুবিবাহ প্রথা, বর্ণবৈষম্যের চিত্র, উঁচু - বংশের মানুষের অর্থহীন অহংকার, অমানবিক আচার- বিচার, অন্তঃসারশুন্যতা, মিথ্যাচারের, অধঃপতনের চিত্র, কাঠ - মোল্লাদের শঠতার চিত্র । যে চিত্র এতদিন পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে ছিল । হতে পারে সে পাঠক এপার বাংলার অথবা ওপার বাংলার ।

মুসলিম সমাজ জীবন ছাড়াও তাঁর সাহিত্যের একটি বড় এলাকা হল গ্রাম্য প্রোলেতারিয়েত এলাকা- মাঝি-মাল্লা, দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণ, চাষিমজুর । তারই সঙ্গে পারিপার্শ্বিকভাবে যুক্ত নাবিক ও জাহাজীদের জীবন, সেই সঙ্গে কিছু লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের চরিত্র- 'খন্ড চাঁদের বক্রতায়' যেমন ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে-এদের জীবনের উল্লাস ও বেদনা, সুখ ও দুঃখ, বঞ্চনা ও মৃত্যুর ছবি, এমনকি এদের মুখের ভাষা-কী আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন তিনি ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অধিকাংশ গল্পে আমরা লক্ষ্য করি, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নিছক ব্যঙ্গ অনুপস্থিত, যে ব্যঙ্গ তাঁর মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে লেখা একাধিক গল্পে লক্ষ্য করা যায়। ব্যঙ্গ না থাকার কারণও অবশ্য অস্পষ্ট নয় । মূলত মৃত্যু-তাড়িত ক্ষুধা, রুগ্নতা, দারিদ্র্য ও জীবনযাপনের চূড়ান্ত শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক দীনতা এই গল্পগুলোর উপজীব্য । তাদের মধ্যে কয়েকটি গল্পে তো আবার পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়ানক করুণ চিত্র উপস্থিত । অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখক খুব সংযত সহানুভূতি নিয়ে চরিত্রগুলোর খুব কাছে থেকে তাদের আর্তি লক্ষ্য করেছেন । কোথাও তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয় । কিন্তু চরিত্রগুলির মনের মধ্যে ঢুকে তাদের কাতর কল্পনার সরণীটি তিনি গ্রহণ করেন, তার ফলে কখনও কখনও তাদেরই তীব্র মানসিকতায় আক্রান্ত তাঁর বর্ণনা, এমনকি নিসর্গ বর্ণনা-প্রায় ডিলিরিয়ামের চেহারা নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গল্পগুলিও মনস্তত্ব প্রধান আখ্যান, এগুলিতে ঘটনা শুধু মনস্তত্বের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত । 'নয়নচারা'-তে আমু অন্নদাত্রী মেয়েটির মুখ খুঁজেছে নয়নচারা গ্রামের মেয়ে ঝিরাকে, তার কাছে বহু দিন পরে পাওয়া মৃত্যু প্রতীক্ষিত শরীরের ক্ষুধাকীর্ণ পেটের জন্য সে ভাত পেল ।

যে ভাতের জন্য সে এই দরজার সামনে এতক্ষণ উন্মাদের মত আর্তনাদ করেছে, সে ভাত সেই মুহূর্তে তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান বস্তু হয়ে উঠল না, বরং তা হয়ে উঠল ওই মেয়েটির মুখ । ওই মুখটিকে আশ্রয় করে সে ফিরে যেতে চাইল তার জন্ম-কর্ম, আশ্রয়, লালন ও সংস্কৃতির শিকড়ে-হঠাৎ প্রকাশিত মমতার ক্ষীণ সূত্র ধরে । 'জাহাজি' গল্পেও করিম সারেঙ্গের অস্তিত্ব মূলত মনোময় । সে ভাবে, নিজের জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা-প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির পর্যালোচনা করে নিজের অন্তরের শূণ্যতায় বিষন্ন থাকে, যে ছাত্তারকে সে মমতা দেখিয়ে স্বান্তনা দিয়েছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেনের অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান করতে পারেনি, সে ছাত্তার যখন জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় তার দিকে পেছন ফিরে তাকায় না, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকে-- ''প্রেতের মত আবছা হয়ে-চোখ দুটো তার দীনতায় বীভৎস হয়ে উঠেছে।'' 'পরাজয়'-গল্পে উপসংহারের মধ্যে খানিকটা অস্পষ্টতা থাকলেও আমার মনে হয় 'পরাজয়' হল কালু ও মজনুর নৈতিক পরাজয়ের গল্প । কারণ কুলসুমের নৈকট্যে তারা সংযত থাকেনি । আমার এ অনুমানের মূলে আছে উপসংহারের আগে ছয়-সাত অনুচ্ছেদের বর্ণনা এবং সময় অতিবাহনের ইঙ্গিত । অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছে, সুন্দরীর নূপুর নিক্কন, দেহের ঘর্ষণে শাড়ির খসখস শব্দ, কালুর কুলসুমের কাছে সরে আসা, মজনুরও অনুরূপ'অদম্য

বাসনা'। শেষ দুই অনুচ্ছেদে ''কখন বৃষ্টি হঠাৎ ধরে গেছে'' কথাটির মধ্যে যে অচেতন সময় চলে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে, দুই অনুচ্ছেদের মুদ্রণে ফাঁক রাখা অংশ আছে তাতে তিনি যে ঘটনা উহ্য রাখলেন তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট থাকে না । ফলে কালু আর মজনুর 'কাঠের মত নিস্পন্দ' মুখেরও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । এটি একটি অসাধারণ গল্প ।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে এই মনস্তত্ত্বের হাত ধরে একটি ভাষারীতির ব্যবহার বারবার লক্ষ্য করা যায় তা হল 'চেতনাপ্রবাহ রীতি' । তবে চেতনাপ্রবাহ রীতির ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হননি । সব গল্পেই তিনি ব্যবহার করেছেন নিজস্ব সমাজ-পরিমন্ডল, বাস্তব সমস্যায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত থাকা কিছু সাধারণ মানুষ, তাদের হাসি-কান্না, দুঃখ বেদনা,আনন্দ-আকাঙ্খা, তাদের বেঁচে থাকার জীবন কাহিনি । ফলে বাংলা চেতনাপ্রবাহ রীতির ধারায় তিনি এক নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করলেন ।

আবার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বেশ কিছু রূপকধর্মী গল্পও লিখেছিলেন । যেমন -'মানুষ', 'ছায়া', 'দ্বীপ' 'রক্ত ও আকাশ' । এ গল্পগুলোর মূল চরিত্রগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ কোন নাম দেননি । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পরিচয়-ছেলেটি, ফকির, মেয়েটি, ধূসর বস্ত্র পরিহিতা, বৃদ্ধ, যুবক প্রভৃতি । শেষ গল্পে জরিনা নাম পাওয়া যায় আবার মানুষ গল্পেও মনির আর মুলকি আছে তাদের নিজস্ব নামে । এই গল্পগুলোতে জীবন জিজ্ঞাসার নানা সূত্র খেলা করলেও এগুলি সার্থক গল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। যেমন-- 'দ্বীপ' গল্পটিতে রয়েছে বর্ণনার প্রাধাণ্য আবার 'রক্ত ও আকাশ', 'মানুষ' বা 'ছায়া' -তে ঘটনার নানা সম্ভব -অসম্ভব ঘটনার সংহতি রক্ষা হয়নি । ফ্রান্স কাফকা তাঁর 'পরিবর্তন' বা 'দুর্গ' গল্পটিতে আখ্যানবয়নের যে একমুখীনতা নির্মাণ করেছেন তা ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় দেখা যায় না । রূপকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি ধারণযোগ্য সংহতি না থাকলে তাঁর সৃষ্টি পাঠকের মনে বিশেষ কোন অভিঘাত সৃষ্টি করে না, এগুলি খানিকটা হেঁয়ালি পর্যায়ে থেকে গেছে । হয়ত জীবন ও তার অন্বিষ্ট সম্বন্ধে কিছু জরুরি কথা তিনি এ গল্পগুলিতে বলতে চেয়েছেন, কিন্তু তা সবসময় ধারণযোগ্য হয় নি । যেটা আরও বড় কথা-ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্যান্য গল্পে যে জীবনসম্পৃক্ত ডিটেলের বিন্যাস আছে, চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখের প্রবল চেনা চেহারা আছে, এই রূপক গল্পগুলো তা থেকে বঞ্চিত । ফলে এগুলো আমাদের কৌতূহলকে কিছুটা টানে, কিন্তু চরিত্রগুলো থেকে যায় অচেনা । ফলে রূপকধর্মী গল্পগুলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমস্ত গল্পগুলোর মধ্যে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েই থেকে যায় । কিন্তু তবুও

ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই রূপকধর্মী গল্পগুলোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে । এটা আরও কৌতূহলের বিষয় এই কারণে যে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, শওকত ওসমান, বিমল কর, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা অন্য কারো লেখায় এই প্রবণতা প্রায় দেখাই যায় না । খুব সম্ভবত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ও দুপারের উদ্‌বাস্তু স্রোত, তার ফলে জীবন ও বিশ্বাসের ক্ষয়-এর মধ্যে এত বেশি অভিঘাত ছিল যে, মনে হয় তাতেই তাঁরা ব্যস্ত হয়ে ছিলেন । যদিও সাহিত্যের এই রকম সরলীকরণ করা যায় না, তবুও ওয়ালীউল্লাহ্‌ স্পষ্টভাবে যে চারটি রূপকধর্মী গল্প লিখেছিলেন তাতে তাঁর গল্পশরীরের মধ্যে নানা বৈচিত্রের ইঙ্গিতই পাওয়া যায় ।

আমরা দেখতে পাচ্ছি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর নিজ গুণেই নিজেকে যেমন বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিকতার মধ্যে স্থাপন করেন তেমনি আবার নিজের রচনাকর্মের বিশেষত্বেই সেই স্রোত থেকে নিজেকে খানিকটা বিচ্ছিন্নও রাখেন । ছোটগল্পের মত উপন্যাসেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সকলের থেকে আলাদা । ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি ছিলেন সমাজ ও কাল সচেতন । সাহিত্য রচনাকে তিনি কখনো বিলাসিতা বলে মনে করেননি । এদিক থেকে তিনি বিদ্যাসাগরের মত উপযোগবাদী । কাজি আফসারউদ্দিনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন-- ''মানুষের নিঃসঙ্গতাই আসল ও খাঁটিরূপ, হয়তো ।.....কোন প্রকার উচ্ছ্বাস আমার ভালো লাগে না, ভাবালুতা তো বরদাস্তই করতে পারি না ।'' অর্থাৎ তিনি যে সমাজের অধিবাসী সেই সমাজের বিশ্লেষণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য । একারণেই তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসটি বিশেষভাবে পূর্ববাংলার মানুষদের কাছে এক অনন্য উপন্যাস । এমনকি তাঁর 'লালসালু' ছাড়াও 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসও বিশ্ব সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে তার অসামান্য দেশ-কাল-চেতনার জন্যে । প্রধাণত সমকালীন, অর্থনৈতিক-ধর্মীয় অসাম্য, জীবনের অপূর্ণতা, গ্লানি ও কদর্যতাকে রূপ দিতে তিনি কলম ধরেছিলেন । বিশেষ করে তিনি নিজের অভিজ্ঞতাময় মুসলমান সমাজের সমস্যা, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা, কুসংস্কারচ্ছন্নতাকে তিনি প্রগতিশীল চেতনার আলোকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছিলেন কথা সাহিত্যে । তাই বাঙালি মুসলমান সমাজের একান্ত নিজস্ব সংকট তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে রূপ পেয়েছে ।

প্রশ্ন আসতে পারে তিনি কি শুধু মুসলমান সমাজের লেখক ছিলেন? তা কিন্তু নয় । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমানের আত্মিক ভুবন আবিষ্কার ও তাকে শিল্পরূপ দেওয়া ।

কারণ তখন অনেক মুসলমানেরই মনে হত বাঙালি সাহিত্য মানেই বাঙালি হিন্দুর সাহিত্য । আর তাই মুসলমানের বর্জিত । ফলে অনেকেই রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে খাঁটি ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বাঙালিত্বের সব নিদর্শন ত্যাগ করতে চাইতেন । এরকম এক সন্ধিক্ষণের সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক অবিভাজ্য বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ স্পষ্ট করার প্রেরণায় ওয়ালীউল্লাহ্ তথাকথিত অন্ত্যেবাসী মুসলমানের মর্যাদা দিতে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন । বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের অস্থির দিনগুলিতে পাকিস্তান নামক সব পেয়েছির দেশের কল্পনায় মশগুল হয়েছিল যে মুসলমান সমাজ, সেই সমাজে তখন সাহিত্য সৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব সূচিত হয়েছিল । শুধু সাহিত্য কেন, সেদিনের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই অষ্টাবক্র রূপ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রত্যক্ষ করে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । আর তাঁর সেই পরিশ্রমের ফসল 'লালসালু' । বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পটভূমি, অতি পরিচিত মানুষ সামাজিক ও মানসিক পটভূমি যেমন এখানে চিত্রিত হয়েছে তেমনি বদ্ধ সমাজের শোষণ ও অত্যাচারের পটভূমিতে ব্যক্তির জীবনজিজ্ঞাসার রূপায়ণ এই 'লালসালু' । এই উপন্যাসে বাংলাদেশের পল্লীসমাজ জীবন্ত রূপ পেয়েছে । রূপায়িত হয়েছে গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্র এবং তাদের মুখের ভাষা । এদিক থেকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে 'লালসালু' একটি দিক্‌চিহ্ন । আধুনিক কথাসাহিত্যের শিল্পচেতনা ও শিল্পপ্রকরণ এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। কেননা, গ্রাম্য সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে, দুর্মর-কুসংস্কার ও ধর্মব্যবসার মর্মান্তিক প্রকৃতি নিরূপণে প্রথম সার্থক রূপায়ণ এই 'লালসালু' । লেখকের প্রাকরণিক অভিনবত্ব, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিমিতিবোধ উপন্যাসটিকে শিল্পরসোত্তীর্ণ করেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' । এই উপন্যাসের নায়ক গ্রামের স্কুল শিক্ষক আরেফ আলী । উপন্যাসে ঘটনা বলতে তেমন কিছু নেই ।বরং এর বিশেষত্ব রয়েছে এর রচনারীতিতে । উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহরীতিকে অবলম্বন করে আরেফ আলীর অন্তঃবাস্তবতাকে মেলে ধরেছেন লেখক । তাই কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনা নয়, নায়কের মনের বিশ্লেষণই এখানে প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় বলে গৃহীত হয়েছে । তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তেও মানব মনের অন্তর্লোকের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে । প্রকৃতার্থে ব্যক্তির সংকট ও সংকট মুক্তির প্রয়াস এবং অসাফল্যের নিপুণ বিশ্লেষণ এই 'কাঁদো নদী কাঁদো'। উপন্যাসের নায়ক মুহাম্মদ মুস্তফা কীভাবে নিঃসঙ্গতায় ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে আত্মহননের পথে চলে গেল সেই অন্তর্লোকের বিশ্লেষণেই উপন্যাসটি মুখর । মুহাম্মদ মুস্তফা ছাড়াও বাকাল নদীর

কান্না সর্বপ্রথম শুনতে পেয়েছিল সাকিনা নাম্নী যে মেয়েটি, তার মনোগত অনুসরণ এবং হৃদয়বৃত্তির বিস্তৃত পরিশীলনের পাশাপাশি এসেছে তার সামাজিক, শ্রেণিগত কিংবা অর্থনৈতিক দিকগত অবস্থানের প্রসঙ্গটুকুও । এছাড়া যে দীর্ঘ বর্ণনায় সাকিনা খাতুনের স্কুল অভিমুখের পদচারণার চিত্রটুকু তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে একের পর এক মিছিল করে এসেছে কুমুরডাঙ্গার বিভিন্ন মানুষ, তাদের বিভিন্ন পেশা এবং মনোভাব নিয়ে । এ যেন তাদেরই লোভ, বৈরিতা, ক্ষমতা এবং অক্ষমতার এক নির্ভুল প্রতিচ্ছবি ।

এছাড়া এ উপন্যাসে যেমন উঠে এসেছে ব্যক্তি মনের সমস্যা তেমনি উঠে এসেছে সামাজিক সমস্যাও । ওয়ালীউল্লাহ্ চেতনাপ্রবাহ ধারার কোনো রীতিগত বাধ্যবাধকতায় উপন্যাসের বিষয়বস্তু থেকে নিজ দেশ, কাল এবং সমাজকে বিচ্যুত করে কিংবা বিচ্ছিন্ন করে দেখাননি । তিনি নিজ দেশ-কাল এবং সমাজকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই চেতনাপ্রবাহ রীতির মত এক জটিল চিন্তাধর্মী, নিরীক্ষা-প্রধান আধুনিক সাহিত্য পরিমন্ডলে বাংলা উপন্যাসের শিল্প চৈতন্য এবং শিল্প সম্ভাবনাকেই উচ্চে তুলে ধরেছেন । আর এখানেই বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির ক্রমবর্ধমান ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আর সকলের থেকে ব্যতিক্রম ।

এত গেল ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাংলা উপন্যাসের কথা । এবার আমরা আসব তাঁর ইংরেজি উপন্যাসের আলোচনায় । ওয়ালীউল্লাহ্ যে দুটি ইংরেজি উপন্যাস লিখেছিলেন সে দুটি হল- ‘দ্য আগলি এশিয়ান’ বা ‘কদর্য এশীয়’ এবং ‘হাও ডাস ওয়ান কুক বিনস’ বা শিম কীভাবে রান্না করতে হয় । উপন্যাসের ‘দ্য আগলি এশিয়ান’ নাম থেকেই বোঝা যায় উপন্যাসটি জে.লেডারার এবং ইউজিন বারডিকের ‘দ্য আগলি আমেরিকান’ উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত । ‘দ্য আগলি আমেরিকান’ নামে তীব্র কমিউনিস্টবিদ্বেষী উপন্যাসটির গরীব দুনিয়ার মানুষের পক্ষ থেকে লেখা এক দুর্মুখ প্রত্যুত্তর এই ‘দ্য আগলি এশিয়ান’। এ উপন্যাস দুটির সাযুয্য শুধু বহিরঙ্গেই নয় অন্তরঙ্গেও রয়েছে । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শুধু উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গিকে উল্টো করে দিয়েছেন । যা একজন এশিয়বাসীর পক্ষে সোজা বলে মনে হবে ।

১৯৬৫-এর দশকের উপান্ত থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অনুপ্রেরণায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে যে জাতীয় মুক্তির লড়াই শুরু হয়েছিল, ‘দ্য আগলি আমেরিকান’ উপন্যাসটি রচনার পটভূমি ছিল সেটি । এ উপন্যাসের একটি ইচ্ছা যদি থাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে একটি ইতিবাচক মোড়কে হাজির করা তবে অপর ইচ্ছাটি হল গরিব মানুষের মুক্তির লড়াইকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে মার্কিন

কূটনীতির সামনে কিছু কৌশল ও সুপারিশ তুলে ধরা । এশিয়ার বুকে কল্পিত দেশে এর কাহিনি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় । এরপর সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ধীরে ধীরে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রী হিসেবে প্রবেশ করতে থাকে ক্ষমতার নায়কেরা । মার্কিন রাষ্ট্রদূত, উচ্চপদস্থ মার্কিন সেনাকর্তা, এশিয়ার কল্পিত দেশটির বিভিন্ন জন নেতা, সাধারণ জনগণ প্রমুখ । পলিটিক্যাল থ্রিলারের ধাঁচে রচিত উপন্যাসটির সমাপ্তিতেও উপন্যাসের দুজন লেখক ক্ষান্ত না হয়ে উপন্যাসের শেষে সমাপনী অধ্যায় হিসেবে নিজেদের বক্তব্য সাজিয়ে তাঁরা একটি প্রবন্ধও জুড়ে দেন ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'দ্য আগলি এশিয়ান' শৈলীর দিক থেকে 'দ্য আগলি আমেরিকান' উপন্যাসের ধাঁচটিকেই আগাগোড়া অনুসরণ করেছে । সেই কল্পিত এশীয় রাষ্ট্র, ক্ষমতার সেই নায়কেরা, উপন্যাসের শেষে একটি প্রবন্ধে নিজের বক্তব্যের সরাসরি উপস্থাপন, এ যেন অনেকটা পরশুরামের 'উলোটপুরাণ-এর গল্প । ওয়ালীউল্লাহ্‌ সবকিছুই এক রেখেছেন, শুধুমাত্র এর পাঠটাকে উল্টে দিয়েছেন । এর মধ্যে এক দিকে তিনি দেখিয়েছে কীভাবে দুর্বল ও ছোট দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ক্রীড়াভূমি বানিয়ে তোলে, আর অন্যদিকে দিকে তুলে ধরেছেন তাদের বিরূদ্ধে মানুষের ছক ভাঙ্গা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের কাহিনি । উপন্যাসে আমরা দেখি দেশের সুবিধাবাদী প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকা এশীয় দেশটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং নিজেরাই সাজানো ঘটনা ঘটিয়ে দোষ চাপাতে চায় কমিউনিস্টদের ওপর । যদিও তাদের সে প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় না -

''সহসা একটি জিপ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় ।

'আমাদের বন্ধু কারা'? যুবক চেঁচায়।''

'আমেরিকা','আমেরিকা' ।সমবেত কণ্ঠে জবাব আসে ।

'আমাদের শত্রু কারা'?

'কমিউনিস্ট''কমিউনিস্ট'।

টেপরেকর্ডার-বহনকারী বিদেশী সাংবাদিক বিরস বদনে পার্শ্ববর্তী স্থানীয় সাংবাদিকের কানে কানে ফিসফিস করে বলে, 'কোন লাভ নেই, 'কমিউনিস্ট' জিনিসটা কী এরা তাই জানে না । তাহলে নাম ধরে বলছে না কেন, স্বাধীনতা দল না কী যেন নাম ?

.....

তখন একটি ব্যাপার ঘটে। দর্শকদের মধ্যে থেকে এক লোক ছুটে বেরিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, চাল পুড়িয়েছে কে ?'

কয়েকজন সমস্বরে বলে ওঠে 'সরকার, সরকার'।

'এটা কী' স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন কনসাল । কেউ উত্তর দেয় না, নিজেও তিনি কোন উত্তরের অপেক্ষা করেন না, কারণ ততক্ষণে দর্শকদের মধ্যে হট্টগোল বেঁধে গেছে । ঘটনার মাথামন্ডু অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে কর্মকর্তা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় । তাকে বাক্‌রুদ্ধ মনে হয়, কারণ সে শোরগোল ও মারামারিতে লিপ্ত মানুষজনের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে । কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে দেখে তার কথা শোনার মত কেউ নেই । তারপর কয়েকটি ছেলে তার ও মার্কিন কনসালের চেয়ারের কাছে আসে । কর্মকর্তাকে উপেক্ষা করে তাদের একজন কনসালকে বলে, 'আপনি বরং তাড়াতাড়ি জায়গাটি ত্যাগ করুন' ।"[২২]

চাল পোড়ানোর দায়ে পরবর্তীতে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়। আসলে ওয়ালীউল্লাহ্ দেখাতে চেয়েছেন দুইয়ের বিপ্রতীপ টানে মানুষের মানবিক পরিণাম কত বিচিত্র দিকে পৌঁছতে পারে এবং তার ধাক্কায় ইতিহাস কীভাবে তার পুরোনো খাত থেকে সরে আসতে পারে । তাই উপন্যাসের শেষে নিজ মন্তব্য জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন--

''সবার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, তার নিজের জন্য যা মঙ্গল, পশ্চাৎপদ দেশগুলির জন্য তা মঙ্গলজনক নাও হতে পারে । সে আজ যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার পেছনে নিঃসন্দেহে অবাধ বাণিজ্যের ভূমিকা, কিন্তু পশ্চাৎ দেশগুলির জন্য তা অপর্যাপ্ত ও নৈরাজ্যজনক নাও হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এও মেনে নিতে হবে যে, দরিদ্র দেশগুলি যা চায়, রাশিয়া ও চীন না থাকলেও তারা তা-ই চাইতে পারত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এও বুঝতে হবে, পশ্চাৎপদ দেশগুলির কোনটি যদি তাদের বিপরীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করে, তাহলে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় ও রাশিয়ার বিজয় হিসেবে বিবেচ্য হওয়া উচিত নয় ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একথাও মনে করার কারণ নেই যে, একটি পশ্চাৎপদ দেশের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাশিয়া বা চীনের দিকে ঝুঁকে পড়বে । পশ্চাৎপদ যেসব দেশ নানা-রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা করছে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু বা মিত্র না হতে পারার কোন কারণ নেই । ''[২৩]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরেকটি ফিকশনধর্মী রচনা হল 'শিম কীভাবে রান্না করতে হয়'। এটি একটি স্যাটায়ারধর্মী কল্পকথা । এতে একই সঙ্গে রয়েছে ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং রম্যরচনার আমেজ। আবার ওয়ালীউল্লাহ্‌র অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাবও এতে পাওয়া যায় । যেমন --

''একজন এশীয় যতক্ষণ এশিয়ায় অবস্থান করেন, ততক্ষণ তিনি এশীয় নন । ঠিক যেমনটা ফ্রান্সে অবস্থানকালে একজন ফরাসি নন। একজন এশীয় এশীয় হয়ে ওঠেন একজন এশিয়া-বহির্ভূতের সাক্ষাৎ পেলে, ঠিক যেমন করে অফরাসির দেখা পেলে একজন ফরাসি ফরাসি হয়ে ওঠেন ।''[২৪]

সাধারণত ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা অহাংকারী হয়ে থাকেন। তারা গর্বিত থাকে তাদের সভ্যতা, সম্পদ ও সংস্কৃতি নিয়ে। তারা হেয় জ্ঞান করে এশীয়দেরকে, যে এশীয়দেরকে তারা শোষণ ও লুণ্ঠণ করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে । ওয়ালীউল্লাহ্‌ চেয়েছিলেন সেই এশীয়বাসীদের আবেগ ও বঞ্চনার কথা পশ্চিমি পাঠকদের কাছে স্যাটায়ারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে । তাঁর 'হাও ডাস ওয়ান কুক বিনস' সম্ভবত সে উদ্দেশ্যেই রচিত । মোটকথা এই গ্রন্থদুটির মাধ্যমে আমরা এক অন্য রকম ওয়ালীউল্লাহ্‌কে পাই যিনি এতদিন ছিলেন আমাদের চোখের আড়ালে। আবার সাহিত্যচর্চায় ওয়ালীউল্লাহ্‌ যে জীবনের শেষ দিন পযর্ন্তও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন তাও আমরা বুঝতে পারি ।

সবদিক আলোচনা করে আমরা একথা বলতেই পারি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর সমসাময়িক লেখকদের থেকে অনেকটাই আলাদা। যেমন আলাদা ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ। এদের সকলের বলার কথা, বলার ভঙ্গি, জীবনদৃষ্টি সবই ছিল আলাদা আলাদা । ওয়ালীউল্লাহ্‌রেও তাই । অন্যান্য কথাশিল্পীরা যেখানে গল্প বলেন মাত্র সেখানে ওয়ালীউল্লাহ্‌ গল্প নির্মাণ করেন । আর এখানেই তিনি অনন্য।

বিশিষ্ট এই সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, আলোচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে । কোনো প্রতিভার মূল্যায়ন নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধ প্রয়াসেই শেষ হয়ে যায় না । এ কারণেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম এবং শিল্পভাবনা নিয়ে পূর্বেও যেমন অনেক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ বেরিয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও বেরোবে । আর সেটাই বাঞ্ছনীয়।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ - বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ-৭৬৭ ।

২. কায়সার, শহীদুল্লাহ্ - সংশপ্তক, জোনাকী প্রকাশনী, বাংলাদেশ, পৃ-৬৮।

৩. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - 'লালসালু', উপন্যাসসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৩-৪ ।

৪. ওয়ালীউল্লাহ্ , সৈয়দ - দেশ, ১৫ ই জানুয়ারি ১৯৭২ ।

৫. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - 'বহিপীর', নাটকসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৩৫।

৬. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - 'বহিপীর', নাটকসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৩৬ ।

৭. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - ভূমিকাংশ, সুড়ঙ্গ' নাটকসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৫৫

৮. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - 'সুড়ঙ্গ', নাটকসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৭৯ ।

৯. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - 'উজানে মৃত্যু' নাটকসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৫০

১০. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - 'উজানে মৃত্যু' নাটকসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৪৪

১১. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - 'উজানে মৃত্যু' নাটকসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-৫০

১২. মুখোপাধ্যায়ের, প্রভাত কুমার - দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা।

১৩. বসু, বুদ্ধদেব - 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', সাহিত্য চর্চা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা।

১৪. মিত্র, প্রেমেন্দ্র - মানে, প্রথমা।

১৫. 'অভিনয় নয়', কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩৬ ।

১৬. 'বনস্পতির মৃত্যু, কল্লোল, শ্রাবণ ১৩৩৩ ।

১৭. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ - 'বর্তমান গদ্য সাহিত্যের তিনটি ভালো বই'।

১৮. সেন, সুকুমার - বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খন্ড, পৃ-৩৫৫ ।

১৯. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ - আমরা ও তাহারা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ-১০৬।

২০. মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, বাংলাদেশ, পৃ-১৪৫ ।

২১. মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, বাংলাদেশ, পৃ-১৪৪ ।

২২. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - কদর্য এশীয়, অনুবাদ-শিবব্রত বর্মণ, অবসর প্রকাশন, ২০০৬, বাংলাদেশ, পৃ-১৪৮ ।

২৩. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - কদর্য এশীয়, অনুবাদ-শিবব্রত বর্মণ, অবসর প্রকাশন, ২০০৬, বাংলাদেশ, পৃ-১৭৫ ।

২৪. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - শিম কীভাবে রান্না করতে হয়, অনুবাদ-শিবব্রত বর্মণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-১৮ ।